Quest

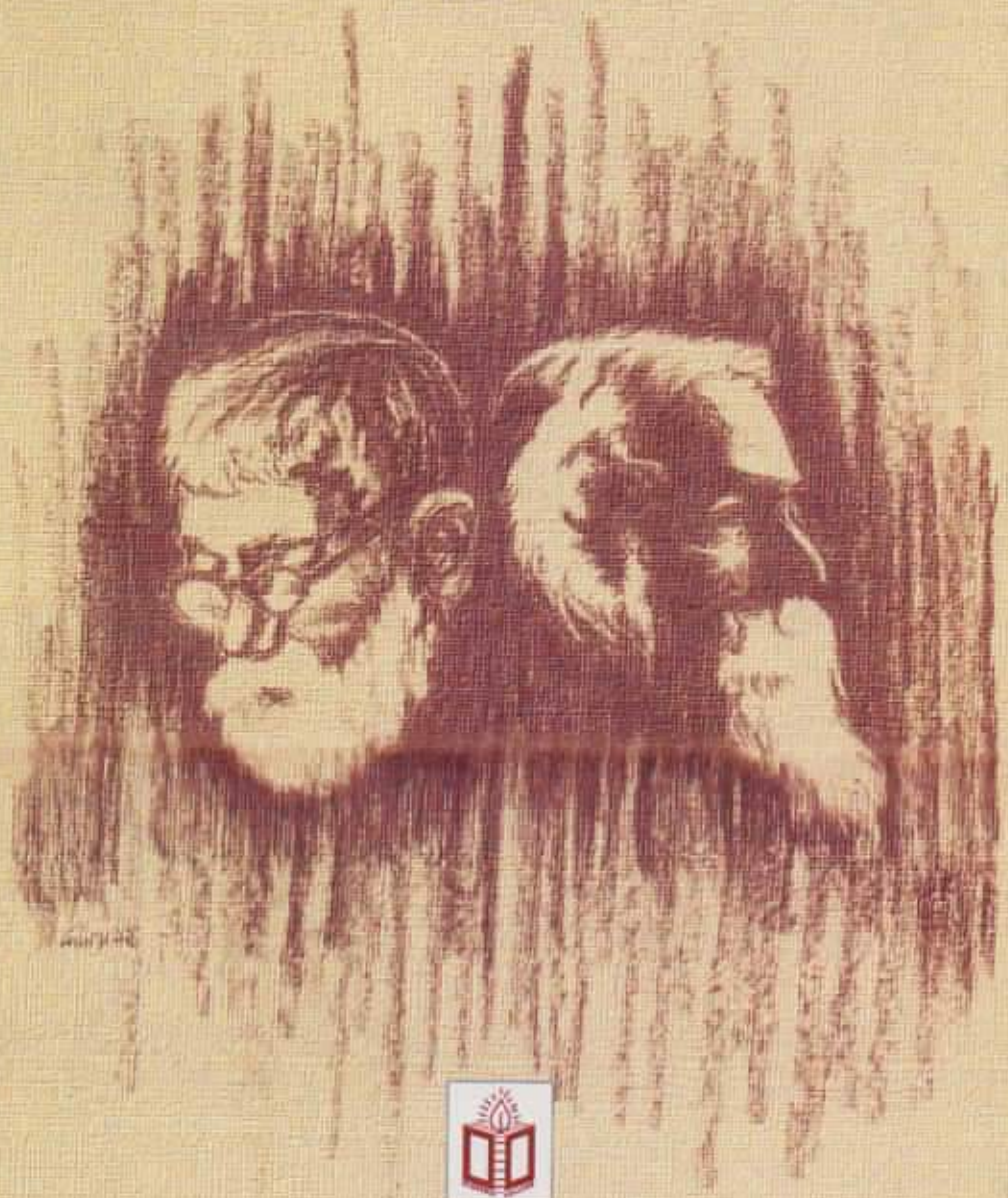

Uluberia College
Uluberia, Howrah – 711315

Quest

A Bi-lingual Academic Journal
2010 - 2011

Vol - 6

A Special Issue
On the Occasion of 150th Birth Anniversary of
Rabindra Nath Tagore and Acharya Prafulla Chandra Ray

Uluberia College
Uluberia, Howrah

Quest

A Bi-lingual Academic Journal

Editor

Dr. Aditi Bhattacharya

Editorial Board

Dr. Debasish Pal, Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya,
Sri Dipak Kumar Nath, Sm. Chandana Samanta, Dr. Uttam Purkait,
Dr. Momtaj Begam

Quest

A Bi-lingual Academic Journal

Vol - 6, 2010-2011

Printed by :

IMPRESSION
108 Raja Basanta Roy Road,
Kolkata 700 029
Phone : 2463 4916

প্রচ্ছদ শিল্পী :

ডঃ নিলয় কুন্ডু

Editorial

Quest—our Academic Journal started its journey seven years back. Encouraged by the appreciations from our friends and readers in various academic circles, our explorations in different branches of knowledge are going on. This volume is a special issue to commemorate the 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore and Acharya Prafulla Chandra Roy.

Our faculty members have contributed articles on the various literary aspects of the great poet and also on the thoughts and works of the great scientist, Sri P.C.Roy. And this time too we have been able to rope in a few scholars from other institutions to enrich our journal with their valuable contributions.

Unfortunately this issue comes out a little later than the scheduled date, as we have to keep waiting for the registration number from the N.R.I office, New Delhi. The process is still going on..We cannot wait any longer, since the relevance of publishing the journal on the above mentioned occasion should not peter out as a result of the inscrutable working of the bureaucratic process.

As before, we welcome our reader's criticisms and suggestions to help us assess the two great men once again in a new light.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রনাথ— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুর্লভ পত্রবিনিময়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম (আচার্য প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসুটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক ও অন্যতম কর্ম কর্তা) রচিত 'গড্ডলিকা' গল্প গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ কৃত সপ্রশংস সমালোচনা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র এবং তদুত্তরে কবির সরস উত্তর ঃ

প্রফুল্লচন্দ্র ছদ্ম-অভিযোগের সুরে লেখেন ঃ 'সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গড্ডলিকার প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য-সম্রাট স্বয়ং তাঁহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ..... এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়।' রবীন্দ্রনাথ ১৮ অগ্রহায়ণ পত্রোত্তরে লিখলেন ঃ 'আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন, মাসিক পত্রবলে যে-সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারতো, ভূষণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন। আমার কথা যদি বলেন — আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েছে। এমন কী, ভাবছি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধির কাজে লাগবো; যে-সব জন্ম-সাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরীর মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন, তাদের ফের একবার জাতে তুলবো। ..... যাই হোক, আমি রস যাচাইয়ের নিয়মে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

(দেশ, সাহিত্য ১৩৭১ 'পত্র বিনিময়' ৬৩-৬৪)

সূচীপত্র

১। রবীন্দ্রদর্শনের আলোকে রবীন্দ্রজীবন ও আমরা
- বাসন্তী ভট্টাচার্য ১-৬

২। উপনিষদ ও বৌদ্ধধর্মের আলোকে রবীন্দ্রনাটক
- ডঃ অদিতি ভট্টাচার্য ১৩-২৫

৩। স্বদেশী আন্দোলনের ধারা ও রবীন্দ্র কথা সাহিত্য
- ডঃ উত্তম পুরকাইত ২৬-৪০

৪। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা - পিউ ভট্টাচার্য ৪১-৪৬

৫। রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্র পর্বের নারী ভাবনা
- ডঃ মমতাজ বেগম। ৪৭-৫৪

৬। রবীন্দ্র ভাবনায় মেঘদূত - স্বাতী সরকার ৬৬-৭০

৭। 'খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা শৃঙ্খল'
- চন্দনা সামন্ত ৭৭-৮১

৮। চলচিত্র কল্পে রবীন্দ্রনাথ - ডঃ নিলয় কুন্ডু ৮২-৮৬

৯। শীর্ণ বাহুর অরণ্যে রবীন্দ্রনাথ - সুপ্রিয় ধর ৮৭-৯৫

১০। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানুষের ধর্ম - জয়িতা দত্ত ৯৬-১০০

১১। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ভাবনার আলোকে সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা
- ডঃ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য ১০১-১০৫

১২। বিপ্লবী লীলা রায়ের স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথ
- ডঃ জয়শ্রী সরকার ১০৬-১০৯

১৩। Recourse to World of Innocence :
Reading of Mother-Child relationship in
Rabindranath Tagore's 'The Crescent Moon'
— Soma Mondal ১১০-১১৬

১৪। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিল্প ও বাণিজ্য ভাবনা - দীপক নাথ ১২৮-১৩০
১৫। Acharya P.C. Roy — Dr. Ratna Bandhopadhyaya ১৩১-১৩৫

আমন্ত্রিত রচনা

১। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে মানুষ ঃ ডঃ মীরাতুন নাহার ৭-১২
২। আর এক মুক্তির রক্তকরবী - সুপ্রিয় ভট্টাচার্য ৫৫-৬৫
৩। 'গীতবিতানের গান - ইন্দ্রাণী গোস্বামী ৭১-৭৬
৪। Tagore as an Environmental Thinker
— Dr. Pranab Kr. Chattopadhyaya ১১৭-১২৭
৫। P.C. Roy : The Modern Enterpreneur
— Soumya Karfa ১৩৬-১৩৯

৩০
৩৫
১২
৬৫
৭৬
২৭
১৯

রবীন্দ্রদর্শনের আলোকে রবীন্দ্রজীবন ও আমরা

বাসন্তী ভট্টাচার্য
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো

— আকাশের বিরাট সূর্য ভূমির শিশিরের কাছে যে মহত্বে ধরা দেয় অতি সাধারণ এই আমাদের কাছেও রবীন্দ্রনাথ ধরা পড়েন তাঁরই সহজ মহত্বে। বলাবাহুল্য বিপুল সে কিরণকে একজীবনে পুরোপুরি ধারণ করা সাধ্যাতীত। তবু যে অনন্ত আলোর সন্ধান মন পায় তা তো জীবনের সম্পদ।

রবীন্দ্র প্রতিভার মূল্যায়ন এ রচনার উপলক্ষ্য নয়। এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে নিজের ক্ষুদ্রত্ব যেমন স্পষ্ট হয়ে যায় পাহাড় বা আকাশের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, তেমনি জীবনের আত্মিক সঙ্কটে নিজেকে বুঝতে ছুটে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে। এ যাওয়া ভক্তের দেবতাসমীপে যাওয়া নয়, ছোট আমির বড়ো আমির কাছে যাওয়া। ভগবান - ভক্তের দূরবর্তী অবস্থান নয় বরং জীবনের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ। নিজেদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যর্থতা-সাফল্যের সামনে মনে পড়ে যায় তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ ব্যথাবেদনাকে। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি বা না পারি তার চেতনার বিপুলতা নিজের দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করায়। তাঁর জীবন, তাঁর দর্শন কখন যেন আমাদের মগ্ন চৈতন্যের অংশ হয়ে ওঠে। সচেতন মন বুঝে নিতে চায় রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রদর্শনকে। আর অবশ্যই মিলিয়ে নিতে চায় অতি আধুনিক এ জীবনকে রবীন্দ্রভাবনার আলোকে।

রবীন্দ্রজীবনের অন্যতম প্রধান দর্শনই হল গতি। গতি মানে জীবন। জীবন মানে কাজ। আর তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাজের তালিকা এত দীর্ঘ। যদিও তাদের কাজ না বলে রীতিমত কর্মকাণ্ডই বলতে হয়। বিপুল সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টির পাশাপাশি কত কী-ই যে করে গেছেন। ক) বিশ্বভারতী সৃষ্টি, তার প্রশাসনিক কাজ, শিক্ষকতা, অর্থ সংগ্রহের প্রাণান্ত চেষ্টা;খ) দেশবিদেশের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া;গ) দেশের এবং বিশ্বের রাজনীতির উত্থান-পতনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া জানানো-অ —

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডই হোক বা স্পেনের গৃহযুদ্ধ ; ঘ) শ্রীনিকেতনে সাধার
মানুষের জীবিকানির্বাহের আয়োজন করা; ঙ) জমিদারী পরিচালনার কাজ। রবীন্দ্রনাথে
দীর্ঘ বিচিত্র কাজের তালিকায় মনে পড়বেই তাঁর বিশিষ্ট জীবনদর্শনের কথা যা অবশ্য
বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। এই স্বল্পপরিসরে এটুকু মনে রাখতে পারি কর্মী রবীন্দ্রনাথে
জীবনদর্শন ছিল কর্মযোগ ও বিশ্বমানবতার দর্শন। বরং পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথের ক
এখানে মনে করা যায়। গল্প-কবিতার পাশে পত্রের মধ্যে এমন এক সত্তা প্রতিফলি
হয় যা তাঁর জীবনদর্শনকে চিনিয়ে দেয় আরো স্পষ্টভাবে।

একথা কিন্তু মন ভোলে না যে এত কাজ করা মানুষটি সংসারবিযুক্ত মুক্তপুরু
ছিলেন না। ছিলেন ভীষণভাবে সংসারী। তবু সমস্ত বন্ধনের মাঝেও এ জগৎসংসার
সম্পর্কে রবীন্দ্রদর্শন মনে করিয়ে দেয় এ জীবনে নিত্যই নির্জন-স্বজনের সঙ্গম চলেছি
তাঁর জীবনে। সেখানে তাঁর মন অসীম-অনন্তবিহারী। কিন্তু বাস্তব মাটির মানুষ রবীন্দ্রনা
তাঁর পরিবার, কর্তব্য, দায়দায়িত্ব কোন কিছুর থেকেই দূরে থাকেন নি। সত্যি ক
বলতে কি নানা কাজের রবীন্দ্রনাথ বিস্ময় জাগায়, শ্রদ্ধা জাগায়। মন বলতে থাকে
বিপুলতাকে একজীবনে বোঝার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, তৈরি হতে থাকে একধরণে
দূরত্ব — সম্ভ্রমের দূরত্ব। অনেকটা সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়ালে যেমন হয় আর কি
কিন্তু যখন তাকাই সংসারী মানুষটার দিকে মনে হয় গুটি গুটি পায়ে গিয়ে বসি মানুষটার
কাছে। প্রতিদিনের জীবনের দায়দায়িত্বের সামনে যখন নিজের জন্য দুদণ্ড সময় বা
করতে হিমসিম খাই অথচ ঠাণ্ডা মাথায় সেই প্রাত্যহিক গ্লানিকে নিঃশব্দে নিজেরই
কাছে সহনীয় করে তুলতে হয় তখনই বুঝি সংসার বিচ্ছিন্ন কোন সাধনক্ষেত্র নয়, সংসারই
সবচেয়ে বড়ো সাধনার স্থান। সমস্ত বন্ধন থেকে নিজের স্বার্থ যখন ছুটি পেতে চায়
অনিবার্য পদক্ষেপে সামনে এসে দাঁড়ায় বহুপরিচিত পংক্তিদুটি —

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভির মুক্তির স্বাদ।।

— নেহাৎ কেজো প্রয়োজনে বহু ব্যবহৃত পংক্তিদুটি কখন যেন নিজের কা
শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

মনে হতে পারে যে, যে সংসারজীবনের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুক্তির দর্শন আলোচি
হয় তা না জানি কত সুখের ছিল। সত্যিই তো সুখের আয়োজনের তো কোন ত্রুটি ছি
না। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সম্ভ্রান্ত ধনী, শিক্ষিত পরিবারে জন্মেছিলেন
ধন-মান-জন কোনটারই অভাব ছিল না জোড়াসাকোঁর ঠাকুর পরিবারে। অথচ সারাজীব

[illegible] ধনের চিন্তা তাঁকে অস্থির করেছে, চিন্তিত করেছে, বিব্রত করেছে। সারাজীবন অর্থের চিন্তায় যেভাবে তাঁকে কাতর হতে হয়েছে তা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবকাশ তৈরী [illegible]। সংসার চালানোর খরচ তুলতে গল্প লিখে পাঠাতে হয়েছে পত্রিকায়, শান্তিনিকেতন গড়তে স্ত্রীর গয়না বিক্রি করতে হয়েছে। এমনকি বৃদ্ধবয়সেও দেশে-বিদেশে বক্তৃতা নিয়ে যেতে হয়েছে বিশ্বভারতীর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ তোলার জন্য। অবিশ্বাসী অসহিষ্ণু মন বলতে চায় এ আর এমনকি বেশী ব্যাপার। একটা লোক নিজের সংসার চালাতে গল্প লেখে, নিজে যা গড়তে চায় তার জন্য স্ত্রীর গয়না বেচে সে তো হতেই পারে। পূর্ণদৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় স্ত্রীর গয়না বেচে, গল্প লিখে , টাকার যোগাড় করে মানুষটা যেটা তৈরী করতে চায় তা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় তৈরী করতে চায় আন্তর্জাতিক মানের মানবিক একটা স্কুল। স্কুলের শাসন মেনে নিতে না পারা সারাজীবন স্কুলছুট একজন মানুষই তো বুঝেছেন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আনন্দকে। যে আনন্দের আদি উৎস প্রকৃতি সেই প্রকৃতিকে যুক্ত করতে চেয়েছেন শিক্ষার সঙ্গে। আজও যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভে তথাকথিত ব্যর্থ পড়ুয়া আত্মহননের পথ বেছে নেয় বা মনোরোগের শিকার হয় তখন মনে পড়ে বৈকি শিক্ষাবিষয়ক রবীন্দ্রদর্শনের কথা। রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধুই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন না, শিক্ষার আনন্দহীন ভারবহনের প্রাণঘাতী ক্লান্তি থেকে নিজেদের সন্তানসন্ততিদের রক্ষা করতে হয়ে ওঠেন অপরিহার্য।

ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের কথায়। কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না সে পথ। জমিদার বংশে জন্মেছিলেন বলেই আমৃত্যু কাব্যসাধনা সম্ভব হয়েছিল এধরণের ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার তাঁকে জীবিতকালেই হতে হয়েছিল। ১৯১৩ সালে যখন তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত তখনও কিছু লোক বলে গেছে শাসক শক্তির দেওয়া পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাখান করা উচিৎ। নতুবা তিনি বুর্জোয়া কবি হিসাবে চিহ্নিত হবেন। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী গড়ে তুলতে যে মানুষটা সর্বদাই অর্থ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত নোবেলের অর্থমুল্য তাঁর কাছে বিরাট সুরাহার পথ। সে পথে অপমানের কাঁটা বিছানো থাকলেও তাঁর যে কিছুই করার নেই।

এ অপমান শুধু বাইরের নয়, ঘরের মধ্যেও সইতে হয়েছে বিশ্বকবিকে। একদিকে নোবেল কমিটি চিঠি লিখছে পুরস্কার গ্রহণের জন্য আর কী আশ্চর্য একই সময়ে তিনি কলহরত দুই জামাইয়ের মধ্যে মিটমাটের আশা নিয়ে নিজে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছেন জামাইদের । বিশ্বকবির এই যন্ত্রনা মুহূর্তে চিনিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথ শুধুই কবি নন, তিনি একজন মানুষ। যে মানুষটা চিঠি লিখে স্ত্রীকে জানায় — 'আমার নিজেকে ঠাণ্ডা করতে যে কত সময় নির্জনে বসে নিজেকে কত বোঝাতে হয়।' বিরাট মাপের মানুষটার ভেতরেও

তাহলে চলতে থাকে নিজেকে বোঝানোর প্রক্রিয়া। সহ্য করার যে শক্তিকে আপাতভাবে অতিমানবিক বলে মনে হয় তার ভেতরেও খুঁজে পাওয়া যায় একজন ধৈর্যশীল মানুষের ছবি। এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —'.....যখন কেউ আমার প্রতিকূলতা করে তখন তার সম্বন্ধে আমার মন সতর্ক হয়ে থাকে , পাছে বিদ্বেষবুদ্ধিতে তার প্রতি কথায় বা ব্যবহারে ভুল করি, এই ভাবনাটা থেকে যায়।' আবার বলেছেন ,'বাইরের' পরে বিরক্ত হয়ে নিজের ভিতরকার সামঞ্জস্যকে ছিন্ন-বিছিন্ন করলে তাতে নিজের ভারি লোকসান।' বাইরের বৃহৎ কর্মজগৎ শুধু নয়, ব্যক্তিজীবনে নিজের কাছে নিজের প্রস্তুতিতেও রবীন্দ্রজীবনদর্শন পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রজীবনদর্শনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না তাঁর জীবনে পাওয়া একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুশোককে অনুধাবন করি। প্রিয়জনের মৃত্যু যেন মিছিলের মত চলেছে। সে মিছিলে প্রথম মুখ তাঁর মায়ের। বৃহৎ পরিবারে ভৃত্য শাসনে বালককাল অতিক্রম করতে না করতেই মাকে হারিয়েছেন। কিন্তু সে মৃত্যু কোন ভয়ংকরতার প্রমান রেখে যায়নি। শিশু বয়সের লঘুতা সে মৃত্যুকে পাশ কাটিয়েছিল। চব্বিশ বছর বয়সে বৌঠানের মৃত্যু বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে স্থায়ী পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয়ের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর । ১৯০২ সালে হারালেন স্ত্রী মৃণালিনীদেবীকে। স্ত্রী কেবল স্ত্রীই নন তিনি সন্তানের মাও বটে। এর পরবর্তী বছরগুলোতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত ও ব্যথিত হতে হয়েছে। সন্তানশোক বহন করতে হয়েছে একাকী নিঃসঙ্গ পিতাকে। কবির মেজ মেয়ে রেণুকা মারা গেল ১৯০৩ সালে। রাত জেগে মেয়ের সেবা করেছেন কবি নন পিতা। মৃত্যুশয্যায় মেয়ে বাবার কাছে শুনতে চেয়েছে উপনিষদের মন্ত্র — ওঁ পিতা নোহসি — তুমি আমাদের পিতা তোমায় নত হয়ে যেন মানি। মৃত্যু যে জীবনেরই অন্যতর প্রকাশ। মৃত্যুর বিরূদ্ধে উন্মত্ততা নয়, এ মন্ত্র সংযত, বিনম্র, দ্বন্দ্ব- উত্তীর্ণ পূর্ণতার মহামন্ত্র।

কন্যার মৃত্যুর দুইবছর পরে ১৯০৫ সালে চলে গেলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ। পত্নী, কন্যা, পিতার মৃত্যুতেও ব্যথার পূজার সমাপন হল না।১৯০৭ সালে অকস্মাৎ মারা গেল কণিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে এ মৃত্যু বড়ো আকস্মিক , বড়ো বেদনাদায়ক। ক্লিষ্ট পিতৃহৃদয় বলে, 'আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা ব্যকুলতা অনুভব করিতেছি তাহার একটা কিনারা না করিয়া আমি কিছুতেই মন দিতে পারিব না।' হৃদয়ের ব্যকুলতা সান্ত্বনা খুঁজে পেল বিশ্বসংসারের — নিত্যপ্রবাহে — 'শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাতে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম

—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার ভালোবাসা বাকি রইল।'

সত্য সত্যই তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ, বেদনা, ব্যথা তাঁর কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। এত শোকের মধ্যেও তাঁর নানাবিধ কাজ ও সাহিত্য চর্চার নিরন্তর প্রবাহ থেমে যায় নি। থেমে থাকে নি তাঁকে দেওয়া তাঁর জীবনদেবতার রুদ্র নিষ্ঠুর আঘাত।

বড়ো মেয়ে মাধুরীলতা যাকে আদর করে ডাকতেন কখনো বেলি কখনো বেলুবুড়ি। তাকে বিয়ে দিয়েছেন। জামাই শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে পাঠিয়েছেন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি রোগ ধরা পড়ল বেলার। যক্ষ্মারোগ। চিকিৎসা চলছে। কিন্তু রোগের গতি একটাই অনিবার্য পরিণতির ইঙ্গিত করছে বারবার। শান্তিনিকেতন থেকে কবি লিখছেন, 'তার মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই।' বুঝতে কষ্ট ছিল না কন্যার যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে। শান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা চলেছে কবির। রোজ সকালে মেয়ের কাছে বসে গল্প শোনান। একদিন সব শেষ হল। শেষ হল না রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা। সেই সন্ধ্যাতেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে চিত্রার বৈঠক। ব্যবস্থার কোন বদল হল না। সমস্ত বেদনা সমস্ত স্মৃতি হৃদয়সমুদ্রের তলে গভীরে লুকিয়ে গেল। অস্ফুট কিছু কথা জেগে রইল 'পলাতকা'য়।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচ ছেলেমেয়েদের মধ্যে রয়ে গেলেন মীরা দেবী এবং রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসন্তান। পিতামহের স্নেহ দিয়ে যাকে ঘিরে রেখেছিলেন সেই মীরাদেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথকে কবি পাঠালেন ইউরোপে ছাপার কাজ শিখতে, প্রকাশন শিল্প আয়ত্ত করতে। তরুণ নীতিন্দ্র আক্রান্ত হলেন মারণব্যাধি ক্ষয়রোগে। রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধু এন্ডরুজ তখন তার পাশে। ছুটে গেলেন মীরাদেবী, নীতিন্দ্রের পিতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে নীতু চলে গেল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তর বছর।

মৃত্যু নিয়ে, শোক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা কত গান। বারবার একই কথার উচ্চারণ — যে ফুল না ফুটে ঝরে গেল, যে নদী মরুতে পথ হারালো তাও আছে। কিছুই হারায় না। এ যে নিছক কাব্যকথা নয় তা তখনই বুঝি যখন নিজের জীবনে ঝড় আসে, দুয়ার ভেঙ্গে পড়ে। উঠে দাঁড়ানো তো দূরের কথা মাথা তোলার শক্তিও থাকে না। মনে পড়ে যায় তাঁরই কথা — 'যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু ঘটে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।' এ যে কতো বড়ো সত্য তা তো রবীন্দ্রনাথ প্রমান করে গেছেন নিজের জীবনে সমস্ত দুঃখ আঘাতকে ধৈর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করে। নিজের জীবনে যখন সুখের বিঘ্ন ঘটে মন তখন অস্বীকার

করতে চায় মঙ্গলময়ের অস্তিত্বকে। তাঁর মতো বলতে পারি কি সুখ যদি ঈশ্বরের দান হয় তবে দুঃখও তাঁরই দান। কী গভীর আস্তিক্য বিশ্বাসে তিনি উচ্চারণ করেন ঃ

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক তবে তাই হোক

আজ আমরা যত আধুনিক হয়ে উঠছি তত নিঃসঙ্গও হচ্ছি। এই নিঃসঙ্গতায় যাঁকে আরো বেশি অনুভব করি তিনি রবীন্দ্রনাথ। আধুনিকতার সমস্তবাহ্যিক উপকরণ আজ আমাদের করতলগত। কিন্তু মননজাত প্রকৃত যে আধুনিকতাবোধ আমাদের শতাব্দী অতিক্রমী করে তুলতে পারে তা আজ সারা বিশ্বেই বিপন্ন। ক্ষমতা দখলের লড়াই, সাম্প্রদায়িকতা, নারী-পুরুষ ভেদে মনুষ্যত্বের অবমাননা আজ সারা বিশ্বের সমস্যা। রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রদর্শনের নিবিড় অধ্যয়নের অঙ্গীকারই হোক যাবতীয় তমোনাশের বীজমন্ত্র।।

সহায়ক গ্রন্থ

(১) ছিন্নপত্র - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(২) পথে ও পথের প্রান্তে - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৩) পথের সঞ্চয় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৪) বাইশে শ্রাবণ - নির্মলকুমারী মহলানবিশ।
(৫) তবে তাই হোক - সোমেন্দ্রনাথ বসু।

আমন্ত্রিত রচনা

।। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে মানুষ।।

ডঃ মীরাতুন নাহার
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপিকা
ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন

মহাভাবুক ও মহাশিল্পী এবং কর্মী সত্তার বিস্ময়কর মিলন ঘটেছিল যে মানুষটির মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মধ্যে চিন্তাভাবনা ও চিত্রণকুশলতা এই দুয়েরও অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি নিজে প্রতিভা ও সৌন্দর্যের অপরূপ ধারকরূপে হয়ে উঠেছিলেন এক দেবদুর্লভ ব্যক্তিত্ব। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেই মানুষ সাহস ও বীর্যবত্তা নিয়ে যিনি জীবনের সমস্ত দায়িত্বের মুখোমুখি হতে পারেন। তিনি সংসারের কোনো দায়িত্বকেই অস্বীকার করেননি। এমন মানুষটির দৃষ্টিতে মানুষ কিভাবে ধরা দিয়েছিল তা অনুধাবন করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা তাঁর সৃষ্টির ভুবনে উঁকি দেব। বিশেষত: তাঁর ছোট গল্পের মাঝে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে আমরা তাঁর মানব-অবলোকন প্রক্রিয়া ও জীবন-দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করব।

মানবজীবনকে কিভাবে দেখেছিলেন রবি-কবি? তিনি বলেছিলেন,

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

সত্যেকে জীবনের ধ্রুবতারা মেনে নিয়ে চলে যেসব মানুষ তাদের তিনি দেখেছেন মানবযাত্রীরূপে। তিনি বলেছেন,

চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি।

অন্তরপ্রদীপের আলোতে জীবনের পথ দেখে নিয়ে এগিয়ে চলা মানুষদের তিনি বিবিধরূপে দেখেছেন এবং সেসব রূপের চিত্রায়ণ করেছেন নিপুণ হাতে। আমরা তাঁর ছোট গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে তেমন কিছু মানুষের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করব। সুখী ও দুঃখী মানুষের চিত্র তিনি এঁকেছেন রাজপথের কথা গল্পে। " প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়;....." কে সে ? রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে সে সুখী মানুষ। অন্যদিকে রাজপথের কথাতে তিনি দুঃখী মানুষকে চিনিয়েছেন এভাবে : "তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই, অর্থ নাই ..... দক্ষিণ নাই, বাম নাই তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, 'আমি চলিই

বা কেন? থামিই বা কেন - তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।" এই কাহিনীতে নির্দিষ্ট মানব - চরিত্র তিনি তুলে ধরেন নি। কিন্তু মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখ কিভাবে ছাপ ফেলে যায়, কিভাবে মানুষের জীবন-ধারায় ভিন্নত্ব এনে দেয় তার সুস্পষ্ট ছবি তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে, সুখ ও দুঃখের দোলাচলে ঘুরতে থাকা মানুষের জীবন কিরূপ তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজপথের উক্তিতে আর পাঠকরা মুগ্ধ হয়ে পড়েন কাহিনী-স্রষ্টার মুন্সিয়ানায়।

পোষ্টমাস্টার গল্পের মাধ্যমে পাঠকদের পরিচয় ঘটে শহর ও পল্লীজীবনে বেড়ে ওঠা দুটি ভিন্নধর্মী মানবহৃদয়ের সঙ্গে। সে দুটি হৃদয় যথাক্রমে বুদ্ধি-চালিত ও হৃদয়-তাড়িত। শহর থেকে চাকুরির টানে গ্রামে আসা তরুণ পোস্টমাস্টার বুদ্ধিনামক চালিকা শক্তির তাড়নায় হৃদয়দৌর্বল্যকে জয় করে বলতে পারে: "জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে,ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার!" রতন নামের গ্রাম্য বালিকাটির করুণ মুখখানি তাকে ক্ষণিকের জন্য দুর্বল করে তুললেও তার কাছে ফেরাতে পারেনা। রতনকে সাথে নিয়ে শহরে ফিরে যাওয়ার ভাবনা থেকে তার বুদ্ধি-চালিত জীবন তাকে মুক্ত করে। অন্যদিকে রতন বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়ের ধারক বালিকা। সে "দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না।" সেই হৃদয়-চালিত জীবন-দর্শন পরিস্ফুট হয় কাহিনীকারের কলমে : 'ভ্রান্তি ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান মাথায় ঢোকে না। প্রবল প্রমাণ অবিশ্বাস করে মিথ্যে আশাকে জড়িয়ে ধরে ..... একসময় চেতনা ফেরে। তথাপি আবারও ভ্রান্তি পাশে ধরা পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়।" কত শত ভুলের সুতো দিয়ে সেলাই করা কাঁথার মতো হৃদয়-তাড়নায় ছুটে ছুটে বেড়ানো মানুষের জীবন!

গিন্নি গল্পে চিত্রিত হয়েছে অশ্রুতপূর্ব শাস্তি-প্রণেতা এক শিক্ষক-রূপী মানুষের চরিত্র -শিবনাথ পণ্ডিত। তিনি তাঁর ছাত্রদের বিচিত্র নাম দিয়ে শাস্তি দেওয়ার সুখানুভূতি উপভোগ করেন। তিনি শশিশেখরের নাম দেন 'ভেটকি', আশুকে বলেন 'গিন্নি'। আদর করে প্রিয়জনকে নানা নামে ডাকার রীতি প্রচলিত আছে সমাজ-সংসারে-সকলেই জানে। কিন্তু শিবনাথ পণ্ডিত মানুষটির শাস্তি-দান রীতি কতো ভয়ানক তা' গল্পকার বুঝিয়ে দিলেন গল্প শোনানোর ছলে গভীর জীবন-সত্য উদঘাটন করে : "নাম জিনিসটা যদি চ শব্দ বৈ আর কিছুই নয়, কিন্তু সাধারণ লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশি ভালোবাসে; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কী কষ্টই না স্বীকার করে..... এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে"। শিবনাথ পণ্ডি ত ছাত্রদের সেই গভীর ভালোবাসার স্থানে ক্ষত সৃষ্টি করে কত আঘাত দিতেন এবং নিজে আনন্দ পেতেন সে কাহিনী পাঠে পাঠকদেরও চৈতন্যমুক্তি ঘটে। মানবমনের অন্ধকার কুঠুরির

কাহিনীতে পাঠক-মন নড়ে-চড়ে বসে। আশু নামের নিতান্তই নিরীহ শান্ত-চরিত্রের কর্মজীবনে তার শিক্ষক-মানুষটির ভূমিকা জেনে পাঠক-হৃদয় ভারাক্রান্ত হয় এবং পাশাপাশি মানব-মনের নিষ্ঠুর, ক্রুর প্রকৃতি জেনে সাবধানতা অবলম্বনে সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

শিবনাথ পণ্ডিত নামে পণ্ডিত কিন্তু আসলে পন্ডিত মানুষ ছিলেন না। প্রকৃত পণ্ডিত মানুষ কেমন হতে পারেন তার দৃষ্টান্ত পাই আমরা <u>তারাপ্রসন্নের কীর্তি</u> গল্পে। সংসার জীবনে নিতান্তই অনভিজ্ঞ তারাপ্রসন্ন কেবল লিখেই চলেছেন জ্ঞান-গর্ভ রচনাদি, কিন্তু কখনও সেসব প্রকাশ করার কথা ভাবেন না। শেষে সংসার অচল হওয়ার দশাপ্রাপ্ত এক সরল-স্বভাবা, সুপণ্ডিত স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী গৃহিনীর পরামর্শে তিনি অতঃপর অর্থোপার্জনের আশায় রচনাগুলি প্রকাশকদের কাছে নিজ অর্থব্যয়ে পাঠাতে শুরু করলেন। অর্থপ্রাপ্তি ঘটে না তাতে; কেবল সমালোচকদের লেখনী মুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন অর্থহীন ভাষায় প্রকাশলাভ করে তাদের প্রশস্তি-বাক্যাদি। মুদ্রার বদলে তারাপ্রসন্ন তিনি পান 'মুদ্রাঙ্কিত' এমন বাক্যসমন্বিত পত্র ঃ ''আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে।" অর্থ প্রাপ্তি না ঘটলেও লেখক মানুষটি বই পাঠিয়ে দিয়ে 'চিন্তাশীল গ্রন্থ' সম্পর্কে ভাবতে বসে এমন মন্তব্যের অর্থ খুঁজে থৈ পান না। সংসার চলবে কিসে? - এমন কঠিন প্রশ্নেরও জবাব খুঁজে পান না তিনি। কাহিনীর পরিণতি ঘটে পণ্ডিত-পত্নীর করুণ মৃত্যুতে। সরসতার মোড়কে পাঠকদের উপহার দেওয়া এমন একটি করুণ রসের গল্প আদতে সংসার-জীবনে জ্ঞান-পিপাসু পণ্ডিত মানুষদের অসারতাকে মূর্ত করে তুলেছে। এমন তাত্ত্বিক মানুষদের ব্যবহারিক জীবনের বিড়ম্বনা বড় কঠোর বাস্তব সত্য। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানব-চরিত্র সৃজন নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন এই গল্পে।

<u>রামকানাইয়ের নিবুর্দ্ধিতা</u> গল্পে পাঠকরা যেমন সরল-হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ মানুষ-চরিত্রকে জানতে পারেন তেমনই পাশাপাশি সংসারী চতুর মানুষদের প্রকৃতিও সহজে চিনে নিতে পারেন। রামকানাই মানুষটি 'সত্যকে ধ্রুবতারা' মেনে আদালতে সত্যকথা প্রকাশ করেন স্বীয় তথা পরিবার-পরিজনদের স্বার্থকে বিঘ্নিত করছেন জেনে-বুঝেই, আপন স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী। সে সত্য জেনেও চাতুর্য-প্রকাশে তৎপর স্বার্থপর মানুষরা যে যার মতো নিজেদের কৃতিত্ব আদায়ের লক্ষ্যসিদ্ধ করতে অকপটে মিথ্যা কথা উচ্চারণ করে গেল। তাদের মধ্যে সকলকে ছাপিয়ে গেল বিবাদী পক্ষের উকিল। বললে, লোকটাকে কেমন চেপে ধরেছিলুম তাই ....। আর মর্মান্তিক মন্তব্য শুনতে পাওয়া যায় সত্যোচ্চারণকারী মানুষটির নিজ-সন্তান ও তার বন্ধুদের মুখে ঃ ভয় পেয়েছে বুড়ো তাই ....। গল্পের শেষে গল্পকার পাঠকদের জানালেন

সংসার অনাবশ্যক এই মানুষটি অতঃপর ইহলোক ত্যাগ করলেন। স্রষ্টা মানুষটি এমন নিষ্ঠুর নিয়তির কথা শুনিয়েও সরসতা বিতরণে পাঠকদের বঞ্চিত করেন না। জানা গেল, তাঁর বয়ানে, রামকানাইয়ে মৃত্যুর পর "কেউ কেউ বললে, আর কিছুদিন আগে গেলেই ভালো হতো কিন্তু তাদের নাম করতে চাই নে।" রামকাইয়ের 'নির্বোধ' চরিত্র লেখকের এই টিপ্পনীতে অধিকতর প্রকট হয়ে ওঠে।

ব্যবধান গল্পের বনমালী ও হিমাংশুমালী সম্পর্কে দুই ভাই। তারা দুজনেই গাছপালা-প্রেমিক। কিন্তু তাদের সেই প্রেমিক চরিত্রের প্রকৃতি পৃথক। গল্পকার সেই পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলেন চরিত্র-চিত্রণের কুশলতায়। প্রবীণ বনমালী হৃদয়ের শখ মেটাতে গাছপালার পরিচর্যা করেন। তিনি গাছপালাদের অচেতন জীবনরাশি গণ্য করে, মানুষের শিশুর চেয়েও অসহায় ভেবে নিয়ে যত্ন করেন। অন্যদিকে নবীন হিমাংশুমালী বুদ্ধির শখ নিয়ে বাগান রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হত। সে অঙ্কুর গজানো, কিশলয় দেখা দেওয়া, কুঁড়ি ধরা, ফুল ফোটা—এসবই গভীর আগ্রহসহকারে নিরীক্ষণ করত। প্রকৃতি-প্রেমিকদের মধ্যে এমন ভিন্নত্ব স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা এবং তাঁর সেই দেখা চিত্রিত হয়ে রূপ নেয় এমন গল্পে যার স্বাদ ভিন্নতর।

দৈব ও ঈশ্বরবিশ্বাসী সৎ, সরল অশিক্ষিত মানুষ রাইচরণ। স্রষ্টার সৃজন-নৈপুণ্যে সেই মানুষটি পাঠকদের অকপট শ্রদ্ধা কেড়ে নেয় গল্পের দুনিয়ায় অসংখ্য চরিত্র-মাঝে হারিয়ে না গিয়ে। সে বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বরই তার প্রভুর হারিয়ে যাওয়া শিশু 'খোকাবাবু'কে তার ঘরে খোকা করে পাঠিয়েছে। সে তাই নিজের সন্তানকে দূরে দূরে রেখে পিতৃহৃদয়ের সকল দুর্বলতাকে জয় করে মনিবের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে যে, সেই শিশুই তাঁর হারিয়ে যাওয়া সন্তান। মনিব তাকে ভুল বোঝে। শিশুচুরির অপরাধে অপরাধী ভাবে। সে প্রভুর কাছে থাকতে চায় সন্তানের সংস্পর্শে থাকতে পারবে ভেবে। তার সে আর্জি খারিজ করে দেন মনিব। মনের দুঃখে সে বিদায় নেয়। ধনবান মনিব তার গাঁয়ের ঠিকানায় কিছু অর্থ পাঠিয়ে দেন। সে অর্থ ফেরত আসে। সংসারজীবনের বিচিত্র ধরণের চরিত্রদের মাঝে রাইচরণের মতো এমন প্রভুভক্ত, নির্লোভ চরিত্র বিরল। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাইচরণ তাই সামান্য হয়েও অসামান্য; সাধারণের মাঝে অসাধারণ একটি মানুষ।

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বেশ কিছু স্বতন্ত্রস্বভাবা মানবী-চরিত্র। অনধিকার প্রবেশ গল্পের জয়কালী তাদের মাঝে আর্কষণীয় নানা দিক দিয়ে বিচারে। একাধারে তিনি কঠিন, উন্নত, স্বতন্ত্র সকলের কাছে। অন্যদিকে তিনি রাধানাথ জীউর মন্দিরের রক্ষয়িত্রী হিসাবে সুকোমল, সুন্দর অবনম্র। স্ত্রীচরিত্র হিসাবে তিনি অনন্যা মানবীকুলে তো বটেই, সমগ্র মনুষ্যসমাজেও। তিনি অন্যায়কারীর প্রতি যতখানি নিষ্ঠুর হতে পারেন

তোধিক কোমলপ্রাণা হতে পারেন অসহায় প্রাণীদের প্রতি। তাই যে মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার কাজে তিনি কঠোরস্বভাবারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন সকলের কাছে, সেই মন্দিরের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করা প্রাণভয়ে শংকিত একটি শূকরকে তিনি রক্ষা করলেন নিজেকে মিথ্যাভাষণের অপরাধ সম্পন্ন করেও। এমন একটি বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয়ী চরিত্র-চিত্রণের পশ্চাতে স্রষ্টার মনুষ্য-চরিত্র পাঠের দক্ষতাই যে ক্রিয়াশীল হয়েছে তা গল্পপাঠশেষে পাঠকমাত্রেরই উপলব্ধিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিবারের নাগপাশ ছিন্ন করা বিদ্রোহী দুই মানবীকে তাঁর রচিত একই গল্পে মেলে। তাদের একজন পাঠকমহলে সাড়া ফেলেছে কিন্তু অন্যজন তাদের নজর এড়িয়ে গেছে। তারা হল স্ত্রীর পত্র গল্পের মৃণাল ও বিন্দু। মৃণাল বহুল-আলোচিত চরিত্র। বিন্দুর চরিত্র নিয়ে কেউ কথা বলার আগ্রহ দেখায় নি। অথচ বিন্দু, অতি সাধারণ একটি দরিদ্র ঘরের কন্যা, পাগল স্বামীকে বরণ করে নিতে না পেরে মৃত্যুকে বেছে নেয়। দুর্ভাগ্যকে সে নিয়তি বলে মেনে নিতে পারে নি বাঙালি সমাজের আর দশজনের মতো। সে তাই বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে তার নিজের সাধ্যায়ত্ত পন্থায়। অন্যদিকে বাহবা কুড়ানো মৃণালকে বস্তুতঃ পথ দেখিয়েছে বিন্দুই। তার জীবনের বন্ধনদশাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে বিন্দুর বিদ্রোহ। তারপর সে ঘর ছেড়েছে। মেয়েদের ঘরের বন্ধাবস্থার প্রতি কটাক্ষ হেনেছে। বিদ্রোহী হয়েছে। বলতে পেরেছে অকুণ্ঠ স্বরে ঃ "তোমাদের ঘরের বউ -এর যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসর্তক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশী দিয়ে ফেলেছেন.....।" স্রষ্টার হাতে দু'টি চরিত্রই বিদ্রোহী রূপে চিত্রিত হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্ভাগা বিন্দু পাঠকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি তার যথাযথ মর্যাদায়। তবুও বিন্দু-চরিত্রের স্রষ্টা হিসেবে গল্পকার রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অভিনন্দন যোগ্য।

শেষ করা যাক অপরিচিতা কাহিনীর কল্যাণীর কথা বলে। সমাজ-সংসারে এই মেয়েরা আজও সংখ্যায় এত নগণ্য যে দৃষ্টিগোচর হয় না। তবুও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায়নি। গল্পের নায়ক চরিত্র কল্যাণীর হৃদয়ে একটুখানি মাত্র জায়গা পাওয়ার জন্য কাতর হয়েও ব্যক্তিত্বহীন হওয়ার অপরাধে অস্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। কল্যাণী বলে ঃ" আমি বিবাহ করিব না।" দৃঢ়প্রত্যয়ী সেই স্বর আজও মানবীকণ্ঠে তেমন উচ্চারিত হতে শোনা যায় না। বিবাহকে আজও মানবী জীবনে মোক্ষ বলে গণ্য হতে দেখা যাচ্ছে সমাজ সংসারে। কল্যাণী সেই সমাজ-সত্যকে নিজ-সম্মানকে বিকিয়ে দিয়ে মেনে নিতে পারে নি। দেনা-পাওনা গল্পের নিরুপমা স্রষ্টার হাতেই এমন কল্যাণী সৃষ্টি পাঠকসমালোচকদের ভাবায়। অপরিচিতা হলেও তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত চিনেছেন এবং মেনে নিয়েছেন জেনে তাঁকে তাঁর ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হয়। কল্যাণীর মতো বিরল দর্শন মেয়ে-মানুষ সৃষ্টি করে তিনি সাহসী স্রষ্টার ভূমিকা অর্জন করে নিয়েছেন।

জীবনপথে চলতে চলতে সহযাত্রী মানুষদের বিবিধ রূপ দেখে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তাদের চিত্রিত করে তুলে ধরেছেন। তাঁর ছোটগল্পের ভুবনে তাদের সন্ধান মেলে। কতিপয় চরিত্রদের কথা বলা গেল। এবার কবি-রবির মনের কথা দিয়ে উপসংহার টানা যাক। মানুষ সম্পর্কে তিনি বলেন,

হ'ক না তারা কেহ বা ভালো
কেহ বা ভালো নয়,
এক পথের পথিক তারা
লহো এ পরিচয়।

এক কথায় বলা চলে, জীবনপথে সহযাত্রী মানুষের কথা মনে রেখে চলতে পারে যারা,তারাই মানুষ। এই মানুষের প্রকাশ ঘটে বিবিধ রূপে আর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সেইসব রূপের বিচিত্রতা যার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিতে।।

(২২ মার্চ, ২০১১ উলুবেড়িয়া কলেজের দর্শন বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা)

উপনিষদ ও বৌদ্ধধর্মের আলোয় রবীন্দ্র নাটক

ডঃ অদিতি ভট্টাচার্য্য
দর্শন বিভাগ

"যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালবাসে আড়ালে থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালবাসায়।"[১]

'সেই গভীরের গোপন ভালবাসায়' মজেছে যে কবিমন তার অভিসার শুরু হয়েছিল বাল্যকাল পেরোনো কিশোরবেলায়। পিতা দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র ছোট্ট রবিকে অন্য এক জগতে নিয়ে যেত। কৈশোরের বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে জগতের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার সাথে সাথে কিশোর কবির মন খুঁজে ফিরতো সেই কোন্ অজানাকে যাকে চোখে দেখা যায় না অথচ যার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় সবখানে। বারো বছরের কিশোর গান রচনা করে পিতাকে শোনালেন – "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে / হৃদয় তোমারে পারে না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে"। বিমুগ্ধ পিতা কবি কিশোরের প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। 'জীবনস্মৃতিতে' এই ঘটনাটি বর্ণনা করে কবি লিখেছেন- "গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন ঃ 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তাহার পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক্ আমার হাতে দিলেন।"[২]

বেদে বলা হয়েছে আমাদের অন্তরে নিহিত এই গোপনচারী জীবনদেবতার সন্ধান যিনি পান তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তিনি কবি– তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়ে অসীমের স্পন্দন। বৈদিক ঋষিরা সকলেই কবি – তাঁদের উচ্চারিত মন্ত্রে 'চরম পৌরুষের আর চরম অপৌরুষের অলৌকিক মেশামেশি। "রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গানে নাটকে প্রকাশ্যে আড়ালে আনাচে কানাচে বাঁকে বাঁকে বৈদিক কবির সত্তা অনুভূতি এবং উচ্চারণ ছড়িয়ে আছে আকাশের মতো, বাতাসের মতো, বৃষ্টির মতো, রোদের মতো, ইন্দ্রধনুর মতো।"[৩] আমার প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে রবীন্দ্রনাথের এই বৈদিক কবির সত্তা কিভাবে তাঁর রচিত নাটক গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে তাকে অনুভব করতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন'

ও 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থদুটির অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে বেদ-উপনিষদের মন্ত্রগুলি যে গভীর নিহিতার্থে উন্মোচিত হয়েছে তার সাহায্যে। এখানে মনে রাখা ভাল শুধু বেদ উপনিষদ নয়, বৌদ্ধধর্মের যে মর্মকথা তাও প্রকাশ পেয়েছে এই প্রবন্ধগুলিতে– রবীন্দ্রনাটকে এদের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলিকে আমি আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি সেগুলি হ'ল – 'তপতী', রাজা', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'নটীর পূজা' ও চণ্ডালিকা'। এই নাটকগুলি প্রত্যেকটি রচিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে কিন্তু প্রতিটি নাটকের অন্তর্নিহিত সুরটিতে রয়েছে আশ্চর্য রকমের মিল। প্রতিটি নাটকেই কবি তুলে ধরতে চেয়েছেন মানবজীবনের মূল সত্যটিকে যেটা অনুভব করতে না পারলে ব্যক্তিগতজীবনে, সমাজজীবনে, ধর্মপথে–সর্ব্বত্র দেখা দেয় বিকৃতি ও একধরণের বিচ্যুতি।

কবি অনুভব করেছেন যিনি পরম সত্য তাঁর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। "যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্ছেন সত্য।... খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে।"[৪] উপনিষদে ব্রহ্মকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে তিনি 'সচ্চিদানন্দ'– তিনি 'পরম সৎ' অর্থাৎ পরম সত্য – সত্য অসত্যের সমস্ত ভেদ তাঁর মধ্যে লুপ্ত হয়েছে। তিনি 'পরম চিৎ' অর্থাৎ পরম জ্ঞান– তাঁর মধ্যে জ্ঞান ও অজ্ঞানে কোনো ভেদ নেই। আর তিনি 'পরম আনন্দ' অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ–তাঁর মধ্যে অনন্ত ও নিরানন্দের যাবতীয় বিরোধ একত্রে মিলিত হয়েছে। ... "উপনিষৎ তাঁকে শুধু সত্য বলেন নি, তাঁকে রসস্বরূপ বলেছেন–, যিনি পরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ.... তাঁর মধ্যে একটা প্রেমতত্ত্ব আছে– সেইজন্য সমস্তকে মিলতেই হয়, সেইজন্য বিচ্ছেদ বিরোধ কখনোই চিরন্তন সত্য বস্তু হয়ে উঠতে পারে না।"[৫] কবি স্বভাবতঃ রসতত্ত্বের পূজারী তাই ব্রহ্মকে রসস্বরূপ অর্থাৎ প্রেম স্বরূপ বলে জানতেই কবি বেশী আগ্রহী। জগৎ কবির কাছে মিথ্যা বা মায়া নয়, জগৎ সেই পরম ব্রহ্মেরই আনন্দস্বরূপের প্রকাশ। 'শান্তিনিকেতনে' কবি লিখেছেন 'ঈশ্বর সত্য'। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু তিনি তো শুধু সত্য নন, তিনি আনন্দরূপা-মৃতা। তিনি আনন্দরূপ, অমৃতরূপ।....তাঁর প্রতিটি নাটকে কবি সত্যের এই আনন্দরূপটিকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন আর দেখিয়েছেন জীবনে যে ক্ষেত্রে এই রসের বিকৃতি ঘটে, আনন্দের অনাবিল প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়– সেখানেই সত্য ঢাকা পড়ে যায় মিথ্যার আড়ালে।

'তপতী' নাটকে আমরা দেখতে পাই জালন্ধররাজ বিক্রমদেব বিবাহ করে এনেছেন কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রাকে। সুমিত্রা অসাধারণ সুন্দরী–সুমিত্রার সৌন্দর্যে বিমোহিত

রাজা রাজকার্যকে চরম অবহেলা করছেন। সুমিত্রার পিতৃগৃহ থেকে আসা কতগুলি স্বার্থান্বেষী চাটুকারের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে তিনি বিলাস ব্যসনে দিন কাটাতে বেশী আগ্রহী। এমনকি প্রজাদের উপর অত্যাচারের সংবাদও তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করছে না। প্রজারা তাঁর নিন্দা করছে, কিন্তু সেই লোকনিন্দাকে বিক্রম তাঁর পরম গৌরব বলে মনে করছেন। সুমিত্রাকে এসে তিনি বলছেনঃ "লোকে বলছে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকেও তুচ্ছ করতে পেরেছি; এতবড়ো কথা।"[৯] রাজার এহেন আচরণে সুমিত্রা অত্যন্ত বিপন্ন ও লজ্জিত বোধ করেছেন। যখন প্রজাদের কাতর আর্তনাদ রাজমহিষীর কানে প্রবেশ করেছে আকুল হয়ে রাজাকে তিনি বলেছেন ".... সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে, আমাকে কেন তুমি নিয়ে যাওনা তোমার সিংহাসনের পাশে?"[১০] রাজাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি শুধু রাজার বিলাস সঙ্গিনী নন, তিনি রাজমহিষী—রাজার কর্তব্যেও তাঁর সমান অধিকার। কিন্তু রাজার রাজ-কর্তব্যকে যখন তিনি জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তখন তিনি রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেছেন— এমনকি ব্যর্থতার গ্লানিকে স্বীকার করে নিয়ে মৃত্যু বরণ করে নিতেও দ্বিধা করেন নি। বিক্রমের আচরণ প্রেমের বিকৃতির প্রকাশ। 'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রনাথ প্রেমের এই বিকৃতির উল্লেখ করে বলেছেন : "প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে সেটা প্রধানতঃ রসেরই দিক— সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়— তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার পরম সিদ্ধি বলে মনে করি।... কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।"[১১] প্রেমের সঠিক স্বরূপকে বিস্মৃত হবার কারণেই বিক্রম অসত্যের আরাধনা করে সুমিত্রাকে হারালেন, নিজেও সত্যের পথ থেকে হলেন চির নির্বাসিত। এই নাটকে মহারাজ বিক্রম ও রাজমহিষী সুমিত্রার জীবনের ট্রাজিক পরিণতি মনে করিয়ে দেয় 'শারদোৎসব' নাটকে সন্ন্যাসী ও ঠাকুর্দার কথোপকথন—সন্ন্যাসী : 'ঠাকুর্দা যেখানে আলস্য, সেখানে কৃপণতা, সেইখানেই ঋণশোধ ঢিলে পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী; সমস্তই অব্যবস্থা'। ঠাকুরদাঃ 'সেইখানেই যে একপক্ষে কম পড়ে যায়—অন্যপক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।"[১২] আমাদের জীবনে সমস্ত দুঃখের মূলেই তো এই ঋণশোধের কার্পণ্য। জগৎ ও জীবনের কাছে আমাদের যে ঋণ তার পরিশোধে যখন আমরা অবহেলা করি তখনই বিরোধ ও বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে— মিলনের সুরটি যায় কেটে। রাজা হিসাবে বিক্রমের ঋণ ছিল প্রজার কাছে— রাজকর্তব্যে অবহেলা করে তিনি সেই ঋণশোধ বাকি রেখেছিলেন। স্বামী হিসাবে তাঁর ঋণ ছিল মহিষীর কাছে— তাঁকে নর্মসঙ্গিনী রূপেই দেখতে চেয়েছিলেন রাজা, সহধর্মিণীর মর্যাদা দেননি, তাই

সুমিত্রার কাছে তাঁর ঋণশোধেও ঢিলে পড়েছিল – ফলে কারুর সাথেই রাজার মিলন সম্ভব হয়ে উঠ্‌ল না।

'শান্তিনিকেতনে' কবি লিখছেনঃ " বেদ মন্ত্রে আছে মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া–উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন.... তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।"[১০] এই সত্যটিকে আমরা বিস্মৃত হই– দেবতাকে আমরা শুধু আলোর দিক থেকে চিনতে চাই, সুখের মধ্যে তাঁকে পেতে চাই, তাঁকে শুধু অমৃতস্বরূপ বলেই জানতে চাই। কিন্তু সেই পরম সত্যের মধ্যে যে আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, মৃত্যু ও অমৃত সবই একাকার হয়ে আছে তা উপলব্ধি করতে আমাদের জন্ম জন্মান্তর পেরিয়ে যায়। 'রাজা' নাটকে রানী সুদর্শনার সমস্ত বিরহযন্ত্রণা তো এই না বোঝা থেকেই। তিনি তাঁর আরাধ্যকে শুধু সুন্দররূপেই দেখতে চেয়েছিলেন, শুধু আলোর মাঝেই চেয়েছিলেন তাঁকে বরণ করতে, রাজার কাছে তিনি কেবল সুখটুকুই চেয়েছিলেন আর তাই তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল বিরহের অভিসম্পাত – কোনভাবেই রাজার সঙ্গে তাঁর মিলন সম্পূর্ণ হচ্ছিলনা। প্রতিদিন অন্ধকার ঘরে রাজার সঙ্গে মিলন হয় রানীর। দাসী সুরঙ্গমা রানীকে বলে ঐ অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে তাঁর জন্যই তৈরী– "আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা – এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।"[১১]– রানী অস্থির হয়ে বলেন– "না না , আমি আলো চাই' – আলোর জন্য অস্থির হয়ে আছি।"[১২] সুরঙ্গমা রানীকে বলে– "আমার সাধ্য কী মা যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব।"[১৩] দাসীর কথার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করার মানসিক অবস্থা ছিল না রানীর। বার বার তিনি সুরঙ্গমার কাছে জানতে চান তাঁর রাজাকে কেমন দেখতে, তিনি সুন্দর কি না! সুরঙ্গমা তাঁকে বলে – " সুন্দর বললে তাঁকে ছোট করে বলা হবে।"[১৪] দাসীর এ কথা রানীর হেঁয়ালি মনে হয়। কল্পনায় রাজার একটা বিশেষ মূর্তি গড়ে নেন তিনি–প্রতি রাত্রে রাজার কাছে তাঁর একটাই প্রার্থনা–রাজাকে তিনি দেখতে চান আলোর মাঝে, উৎসবের আনন্দে। আলোর মাঝখানে, উৎসবের মাঝে দেখা দেবার জন্য রাজার কাছে যখন তিনি আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন রাজা তখন তাঁকে বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন " .... যে লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না, আমাকে বিপদ বলে মনে করে আমার কাছ থেকে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে চায়"।[১৫] রাজার এ কথার তাৎপর্য সুরঙ্গমা বুঝতে পারেন নি। শেষপর্য্যন্ত বাইরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রানী নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন রাজার কাছ থেকে– কিন্তু এ বিরহ তো শুধু রাজার থেকে বিরহ নয়, এ তো নিজের অন্তরের প্রকৃত সত্য থেকে বিরহ। রানীর অহংকার নিয়ে তিনি নিজের চারপাশে

সৃষ্টি করেন এক অচ্ছেদ্য আবরণ। 'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন "আমাদের যত দুঃখ, যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছি না বলেই; সেইটে ঘুচলেই তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব, আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।"[১৬] দাসী সুরঙ্গমাকে রানী বলেন –"সবাই যে বল্‌তো, আমার উপর রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই। সেইজন্যেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ করছে।"[১৭] এ কথার উত্তরে সুরঙ্গমা রানীকে বলে "অভিমান না ঘুচলে যে লজ্জাও ঘুচবে না।"[১৮] অনেক দুঃখের পথ পার হয়ে শেষকালে তিনি সুরঙ্গমার কথার অর্থ বুঝতে পারেন। রানীত্বের সমস্ত অভিমান ছেড়ে তিনি পথে নামেন তাঁর রাজার সন্ধানে– "যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলাম ততক্ষণ মনে হয়েছিল, সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে। অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হ'ল– সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ, এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে।"[১৯] হৃদয়ের পথ কেটে কেটে সেখানে তাঁর আরাধ্যের আসন পাতবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হলেন রানী। শেষ পর্য্যন্ত যখন তিনি তাঁর রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তিনি অনুভব করলেন তাঁর রাজা 'সুন্দর' নন, তিনি 'অনুপম'। আঁধার ঘরের রাজা এবার রানীর কাছে ধরা দিলেন আলোতে। কবি বলেছেন : "প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চলতে পারে না।"[২০] সুদর্শনা যতদিন তাঁর নিজস্ব চাওয়া পাওয়ার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পরাধীন হয়ে ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর রাজার প্রকৃত স্বরূপকে চিনতে পারেন নি। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে যেদিন তিনি স্বাধীন হলেন সেদিনই রাজার সাথে তাঁর মিলন সম্পূর্ণ হ'ল।

"উপনিষদ বলছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম। আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্ব জগতে এই যে আনন্দ সমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটাকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা।"[২১]--উপনিষদে বর্ণিত এই আনন্দের প্রতিমূর্তি 'রক্তকরবী'র নন্দিনী। যক্ষপুরীর ফাঁক ফোকর হীন নিরেট কাজের জগতে নন্দিনী হ'ল একটুকরো খোলা আকাশ, নিরানন্দপুরীর অন্ধকারের মাঝখানে আনন্দ আর আলোর ঝর্ণাধারা। তাকে দেখে অধ্যাপক বলেন: "আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশের সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে...।"[২২] কিন্তু ডানা চঞ্চল হলেও, তা বাঁধন ছিঁড়ে উড়তে পারে না। যক্ষপুরীর মানুষ নিরলসভাবে

পৃথিবীর নীচের তলা থেকে সোনা তুলে আনার কাজে মগ্ন। তারা সোনার নেশায় এমনই নেশাগ্রস্থ যে 'আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে' তেমনই সোনার নেশায় বার বার তারা ফিরে আসে যক্ষপুরীর পাতালগর্ভে, যক্ষপুরীর বাইরের স্বাধীন জগতে ফিরে যাবার ইচ্ছাটাকে শুদ্ধ তারা হারিয়ে ফেলেছে। নন্দিনীর মনে হয় পৃথিবীর বুক চিরে তারা যেন 'অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আসছে' তাই তারা সর্ব্বক্ষণ কিসের যেন একটা রাগে, সন্দেহে বা ভয়ে ফুঁসছে। চারিদিকে ভয়ের আবহ তৈরী করার জন্য যক্ষপুরীর সর্দাররা ভয় আর রহস্যের ঘেরাটোপে রাজাকে সরিয়ে রেখেছে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তারের জালের আড়ালে। নিজের শক্তিমত্তার অহংকারে রাজাও আপনাতে আপনি মত্ত, সকলকে ভয় দেখিয়ে সে নিষ্ঠুর আনন্দ পায়। কিন্তু তার শক্তিমত্তার সমস্ত গর্ব চূর্ণ হয়ে যায় নন্দিনীর সামনে। নন্দিনীকে ভয় দেখাবার যাবতীয় কৌশল তার মিথ্যা হয়ে যায়। নন্দিনীর অপরিসীম আনন্দ আর প্রাণশক্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করে সেই কোন্ অনাদিকাল থেকে যক্ষপুরীর যক্ষের ধন আগলিয়ে আর সকলকে ভয় দেখিয়ে সে কত ক্লান্ত, কত একাকী। নন্দিনীকে ডেকে যক্ষপুরীর রাজা বলে– " আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি – তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত...."[২৩]। নন্দিনী আর রঞ্জনের ভালবাসার কথা সে শোনে লোভী শিশুর মত; কিন্তু মনে মনে এটাও বোঝে যে তার শক্তির জোরের থেকে রঞ্জনের ভালবাসার জোর অনেক গুণ বেশি। নন্দিনীর রঞ্জন চলিষ্ণু জীবনের প্রতীক – সে কোনো বাধা মানে না– সকল স্থবিরতা আর বন্ধনকে সে ধূলায় লুটিয়ে দেয়, সে চিরপথিক– তার একমাত্র স্থিতি নন্দিনীর প্রেমে। "এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি– আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয় অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল।"[২৪] প্রেমের স্থিতিগতির এই চরম রহস্যকে জানতে চায় রাজা, স্পষ্ট করে চায় রঞ্জনের প্রতি নন্দিনীর ভালবাসার মানে বুঝতে, সমস্ত কিছু ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়াতেই তার নিষ্ঠুর আনন্দ। সে নন্দিনীকে বলে- -"আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙ্গে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।"[২৫] রাজার পায়ের কাছে রঞ্জনের প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখে নন্দিনী যখন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে রাজার সাথে লড়াই করতে চেয়েছে রাজা তখন তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে বলেছে– "আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি!"[২৬] নন্দিনীর মৃত্যুর

ভয় নেই, সে রাজাকে উত্তর দিয়েছে –"তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।"[২৭] নাটকের শেষ পর্বে দেখি নন্দিনীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে রাজা নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছে। এতদিনকার গড়ে তোলা মিথ্যা ভয় আর শক্তির কুহক জাল ছিঁড়ে ফেলে নন্দিনী আর রঞ্জনের প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রাজা নিজেই অগ্রসর হয়েছে সমস্ত প্রকার মিথ্যা যান্ত্রিকতার অবসান ঘটাতে। রঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু প্রেমের জয় হয়েছে– "প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমেই সীমার মধ্যে অসীম তার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না[২৮]... যক্ষপুরীতে যে আনন্দের খোলা হাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল নন্দিনী শেষ পর্য্যন্ত তা ভাসিয়ে নিয়ে গেল প্রাণহীন কর্মকাণ্ডের শুষ্কতা ও যান্ত্রিকতাকে।

'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন মানুষ কিভাবে ধর্মের রীতি নীতি, নিয়মনিষ্ঠাকে বড়ো করে তুলে তার অন্তরের সত্যধর্মকে বিসর্জন দেয়, মানুষ মানুষে ভেদ রচনা করে মানবাত্মাকে ছোট করে। "ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই জন্যে কৃচ্ছসাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার বিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে[২৯]....'।

অচলায়তনের গৃহ একটি ধর্মসম্প্রদায়ের আবাসস্থল যেখানে সেই কোন্ অনাদিকালের আচারনিষ্ঠার অন্ধ অনুকরণ করে প্রতিটি মানুষ ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়মনিষ্ঠা পালনে একান্ত ব্যগ্র। সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম ধর্মসম্প্রদায়টির অন্যতম প্রধান মহাপঞ্চকের ভাই পঞ্চক। কোনো নিয়মনীতির বাঁধনেই তাকে বাঁধা যায় না। তাকে দেখে সেখানকার আচার্য বলেন "তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের ধর্ম মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য....।"[৩০] পঞ্চক দাদাঠাকুরের মন্ত্র শিষ্য – দাদাঠাকুর কোনো নিয়ম নীতির ধার ধারেন না , তাঁর কাছে উঁচু জাত নীচু জাতের কোনো ভেদাভেদ নেই। শোনপাংশুদের দল, যারা সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী বলে সবার কাছে ঘৃণ্য তাদের সাথে মাঠে ঘাটে সর্বত্র খেলে বেড়ানোয় দাদাঠাকুরের অনাবিল আনন্দ। তিনি বলেন ঝড়ের সাথে খেলা মানে ঝর্ণার ধারার সঙ্গে খেলা, সমুদ্রে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা– সেখানে আছে অনাবিল আনন্দ। পঞ্চকের মনে হয় দাদাঠাকুরের কাছে 'সবাই বড়ো হয়ে গিয়েছে'। দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চককে শুধরে দিয়ে বলেন, "না ভাই, বড়ো হয় নি,

সত্য হয়ে উঠেছে – সত্য যে বড়োই, ছোটোই তো মিথ্যা।"[৩১] এই কথাটা ভুলে যাই বলেই আমরা মিথ্যার আরাধনা করি প্রতিনিয়ত, নিয়মের ফাঁস পরিয়ে আমাদের আরাধ্যকে বাঁধতে চেষ্টা করি। আমরা ভুলে যাই দাদাঠাকুরের সেই কথাটি "যিনি সবজায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।" 'মানুষে ধর্ম' প্রবন্ধের একজায়গায় কবি বলছেনঃ "মানুষের দেবতা মানুষের মত মানুষ। জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমানে সত্য হই সেই পরিমানেই সেই মনের মানুষকে পাই...। মানুষের যত কিছু দুর্গতি তা আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে ....।"[৩২] তাই দেখি শেষপর্য্যন্ত অচলায়তনে ধর্মের নিয়মনিষ্ঠা রক্ষা করার সতর্ক প্রহরায় যে নিযুক্ত ছিল সেই মহাপঞ্চকের হাতেই দেওয়া হয়েছে 'কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার।' এই কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারলেই তো পাওয়া যাবে সেই 'মনের মানুষে'র সন্ধান বাউল যার উদ্দেশ্যে গান গেয়েছেন ঃ 'আমি কোথায় পাব তারে /আমার মনের মানুষ যে রে / হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে/ দেশ-বিদেশে বেড়াই খুঁজে।

'চণ্ডালিকা' নাটকে কবি শুনিয়েছেন মানবধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। এই নাটকের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি কবির যে শ্রদ্ধা তা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মের কুসংস্কার আর মানুষের অমর্যাদা করার ঔদ্ধত্য যখন সমাজে ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল তখনই বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব। সমাজে মানুষে মানুষে যে মিথ্যা ভেদের সৃষ্টি করা হয় বৌদ্ধধর্মে তা অস্বীকার করা হয়েছে – বলা হয়েছে সবাই 'মানুষ'–এ জগতে সকলেরই সমান স্থান, সমান অধিকার। বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কবি তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'মুক্তির স্বাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ "বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে যুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ, অহংকার ত্যাগ, ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা।... এই প্রেম যা সেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে।"[৩৩] কবির মননে বৌদ্ধধর্ম হ'ল মানবতার প্রতীক। 'চণ্ডালিকা' নাটকে আমরা দেখতে পাই চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির কাছে এসে জল চাইছেন পথশ্রমে ক্লান্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দ। চণ্ডাল কন্যা যখন তাঁকে নিজের নিচু জাতের কথা জানিয়ে জল দেবার অনধিকারের কথা বলেছে তখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাকে বলেছেন ঃ 'যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।"[৩৪] সন্ন্যাসী তাকে

বুদ্ধদেব বলেছেন নিজেকে নিন্দা করা পাপ– তা আত্মহত্যার চেয়েও বেশি অপরাধ। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথায় চণ্ডালকন্যা যেন নতুন জন্ম লাভ করল – তার মনে হয়েছে সন্ন্যাসী তাকে সেবিকার সম্মান দিয়ে তার মানবজন্ম সার্থক করেছেন। তার মা যখন তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার নিচুবংশের কথা, তার সামাজিক অবস্থানের কথা তখন সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে ঃ "যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যা। অন্ধ করে, মুখ বন্ধ করে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমায় মানিয়েছে...।"[৩৪] প্রকৃতির এই কথাগুলি মনে পড়িয়ে দেয় 'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রসের ধর্ম' প্রবন্ধের কয়েকটি ছত্রকে ঃ" যে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় সেই ধর্মেরি দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক করেছি। আমরা বলেছি, মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে, মানুষ ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি...."[৩৫] এতদিন পর্যন্ত যে ধর্মকে মেনে প্রকৃতি নিজের মানবতার অসম্মান করেছে মানুষের গড়া সেই মিথ্যা ধর্মকে সে আর মানতে রাজী নয়। চণ্ডালকন্যার মনে হয়েছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাকে শুধু নতুন জন্মই দেন নি, তিনি তার নারীত্বেরও যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। প্রকৃতির মা যখন তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মৃগয়া করতে এসে এক রাজার ছেলে তার রূপে ভুলে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল রাজার ঘরে তখন প্রকৃতি তীব্রতার সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেছে ঃ "ভুলেছিল না তো কী। ভুলেই ছিল সে, আমি মানুষ। পশু মারতে বেরিয়েছিল, চোখে ঠেকে ঠেকেছে, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।"[৩৬] মা মানতে চায় না প্রকৃতির কথা – সে বলতে চায় রাজার ছেলে তো তাকে নারী বলেই চিনেছিল। উত্তরে প্রকৃতি বলে তার মায়ের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় রাজার ছেলে আর সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। রাজার ছেলের কাছে সে একান্তভাবেই একটি নারী– উপভোগের সামগ্রী মাত্র। কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে সে উপভোগ্যা রমণী নয় সে মানবী'– তার মানবী সত্তা, তার নারী সত্তার যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন সন্ন্যাসী। তিনিই তাকে প্রথম চিনেছেন – আর বড় আশ্চর্য এই চেনা। প্রকৃতি মাকে বলে "তাঁকে চাই মা। নিতান্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই, আমি তোমার সেবিকা, নইলে সংসারে সবার পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।"[৩৭]

প্রকৃতির মায়ের কাছে প্রকৃতির এই ভাষা সম্পূর্ণ অজানা – কিসের এক নাম না জানা ভয়ে ত্রস্ত হয় সে। আবার যখন সে দেখে আনন্দের প্রেমে আত্মহারা কন্যার বিরহ বেদনার যন্ত্রণা তখন কঠিন মন্ত্র পড়ে আনন্দকে কন্যার কাছে এনে দেবার কষ্টও অক্লেশে সহ্য করে নেয় সে, শুধুমাত্র কন্যার মুখে হাসি ফোটাবার প্রত্যাশায়। এরপর শুরু হয়

এক দুঃসাহসী সংগ্রাম – মায়া মন্ত্রের টানে মা বাঁধতে চায় কামনা বাসনার বাঁধন কাটানো, সংসারের সুখদুঃখের সমস্ত বোঝা থেকে মুক্ত 'শরৎকালের মেঘের মতো ভেসে চলা' সন্ন্যাসীকে। কন্যাকে সে বলে মায়া দর্পনের দিকে তাকিয়ে দেখতে তার মন্ত্রের বাঁধন কতটা পাকে পাকে জড়িয়েছে সেই সংসার উদাসী সন্ন্যাসীকে – দূর পথ পরিক্রমা ছেড়ে কতখানি কাছে এসেছেন তিনি। মায়াদর্পনে প্রতিফলিত হয় সন্ন্যাসীর অবয়ব। কিন্তু কোথায় তাঁর সেই স্নিগ্ধ সৌম্য আনন্দময় মূর্তি? ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত, পরাজিত এ কার মূর্ত্তি দেখছে প্রকৃতি? এক অজানা সর্বনাশের ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল– "তার পর? তার পরে কী! শুধু এই আমি! আর কিছু না! এতদিনের এই নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্য এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে!"[৪০] নিরক্ষরা চণ্ডালকন্যা সে, কিন্তু তার আরাধ্যের ঐ মূর্তি দেখে তার হৃদয় মথিত হয়ে প্রশ্ন উঠে এসেছে এই তীব্র চাওয়া পাওয়ার পথের শেষ কোথায়? আছে কি তৃষ্ণার শেষ? " ও গো কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো! কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে।"[৪১] লজ্জায় বেদনায় অস্থির প্রকৃতি উপলব্ধি করেছে আনন্দকে একান্ত নিজের করে পাবার ঐকান্তিক কামনায় সে তাঁকে তাঁর আসন থেকে টেনে নামিয়েছে মাটিতে। আনন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে সে আর তাকে ক্ষমা করে আনন্দ তাকে তুলে ধরেছেন মহত্তর প্রেমের মাঝে – যে প্রেমের সার্থকতা ভোগে নয়, আনন্দময় মুক্তিতে।

বৌদ্ধধর্মের এই মানবতার দিকটি মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথকে যে কতটা আপ্লুত করেছিল তার আর একটি প্রমাণ তাঁর রচিত 'নটীর পূজা' নাটকটি। 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে কবি বলেছেন :"একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড় জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের।"[৪২] এই নিখিল মানুষকে যে ধর্ম আহ্বান জানিয়েছিল – ব্রাহ্মণে শূদ্রে যে ধর্ম কোনো ভেদাভেদ রাখে নি সেই ধর্ম স্বভাবতই কবির মন টেনেছিল। 'নটীর পূজা' নাটকটিতে আমরা দেখতে পাই রাজবাড়ীর নটী শ্রীমতী, যে সমাজে পতিতা বলেই স্বীকৃত, তার কাছেই ভিক্ষা গ্রহণ করেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপালি, ভগবান বুদ্ধের জন্মদিনে তার উপরেই পূজার ভার দেন তিনি। রাজকুমারীরা কেউই নটীর এই ভূমিকায় খুশি নন। বিম্বিসার পত্নী মহারাণী লোকেশ্বরী রাজকুমারীদের একত্রে দেখে যখন জানতে চাইলেন তারা সেখানে কি করছে তখন রাজকুমারী রত্নাবলী

[illegible] জয়ের সঙ্গে হাসিমুখে জানালো– "অপেক্ষা করছি উদ্ধারের, মলিন মনকে [illegible] করে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু করে এগোচ্ছি।"[৪০] মহারানী লোকেশ্বরীর একথার উত্তরে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন– "এই নটীর শিষ্যা! শেষকালে [illegible]বে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে, শ্রীমতী তুমি আজ হঠাৎ সাধ্বী হয়ে উঠেছে।... মূঢ়ে রাজবংশের মেয়ে তোরা এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম। যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে – একে ধর্ম বলিস তোরা?...[৪১] রাজকুমারী রত্নাবলী মহারানীর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে ঘৃণাভরে বলেন বৌদ্ধস্থবিরগণ নিজেরাই নীচবংশোদ্ভূত, তাই পতিতাকে সম্মান জানানো তাদের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। বৌদ্ধ ভিক্ষু উপালি জাতিতে নাপিত, সুনন্দ গোয়ালার ছেলে আর সুনীত হলেন জাতে পুক্কস- – একান্ত নীচ জাতি। চারিদিকের এত উপেক্ষা, এত নিন্দা এত ধিক্কার সত্ত্বেও শ্রীমতী কিন্তু তার বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায় অবিচলিত থাকে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সে অনুভব করে বৌদ্ধধর্মে যে সত্য উচ্চারিত হয়েছে তা সবাই একদিন না একদিন উপলব্ধি করবে। নাটকের শেষে আমরা দেখি শ্রীমতীর এই ঐকান্তিক বিশ্বাসের জোর কতটা। বিম্বিসার পুত্র রাজা অজাতশত্রু, যিনি প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের বিকাশে, এমনকি নিজের পিতাকেও বন্দী করেছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন সত্যধর্মের কাছে। তবে তার আগে রাজউদ্যানে স্তূপমূলে পুজোর মন্ত্র উচ্চারণ করে বুদ্ধের স্তব করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে শ্রীমতীকে– রাজার আদেশ ছিল বুদ্ধপূজো যে করবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। শ্রীমতীর উপর আদেশ জারি করা হয়েছিল রাজউদ্যানে যে বেদীতে বসে স্বয়ং বুদ্ধদেব সেদিন ধর্মপ্রচার করেছিলেন সেই আসনের সামনে নটীর বেশ পরে রাজবাড়ির সকলের মাঝে তাকে নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। শ্রীমতী বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে রাজউদ্যানে বেদীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর শুরু করলো তার নৃত্য। নাচ্‌তে নাচ্‌তে এক একটা অলংকার খুলে ফেলে ছুঁড়ে দিতে লাগ্‌লো আবর্জনার মধ্যে। নটীর বেশ একে একে খুলে ফেলতে লাগলো– ভিতরে তার ভিক্ষুণীর শীতবস্ত্র। নত হয়ে বসে শ্রীমতী মন্ত্র পড়তে শুরু করলো 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি / ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।' রাজকুমারীরা ভয়ে চিৎকার করে তাকে থামতে অনুরোধ করলো, কিন্তু শ্রীমতী অকুতোভয়– রক্ষিণীর অস্ত্রাঘাতে মন্ত্র পড়তে পড়তেই সে ঢলে পড়লো আসনের উপর। মহারানী লোকেশ্বরী এগিয়ে এসে শ্রীমতীর মাথা কোলে নিয়ে উচ্চারণ করলেন বুদ্ধের মন্ত্র, শ্রীমতী মৃত্যুতে তাঁরও বোধোদয় হ'ল। তাঁর স্বামী যে ধর্মকে বরণ করে নিয়ে রাজত্ব ছেড়েছিলেন, তাঁর একমাত্র পুত্রও যে ধর্মের কারণে

সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, সেই ধর্মের বিরুদ্ধে এক অজ্ঞাত ক্রোধ দানা বেঁধেছিল মহারানীর মনে। শ্রীমতীর মৃত্যু তাঁর মনের সমস্ত ক্রোধ ও ক্ষোভ দুর করে দিল। তাঁর যেন পুনর্জন্ম হ'ল – নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তিনি। শ্রীমতীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভীত রাজা অজাতশত্রু রাজ উদ্যানে আর প্রবেশ করতে পারেন নি। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শ্রীমতী পূজারিণীর মর্যাদা পেয়েছে– মহারানী লোকেশ্বরী সকলকে জানালেন তাঁরা শ্রীমতীর দেহকে পালঙ্ক করে সকলে মিলে বহন করে নিয়ে যাবেন। এমনকি উদ্ধতা রাজকন্যা রত্নাবলী পর্য্যন্ত শ্রীমতীর পদস্পর্শ করে উচ্চারণ করল বুদ্ধ পূজোর মন্ত্র। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শ্রীমতী প্রতিষ্ঠা করে গেল সত্যধর্মের গৌরবকে।

'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন : "উপনিষদ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে।"[১৫]– 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর / আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর'।

উপরে আলোচিত প্রতিটি নাটকেই কবি এই সীমা অসীমের মেলবন্ধনের কথা বলেছেন। ব্যক্তি তার 'ছোট আমি'র সীমায় যখন ধরতে পারে 'বড়-আমি'র অসীমতাকে তখনই তার জীবনবীণাটি বেজে ওঠে সুরের ছন্দে – আর সে সুরের ছন্দ ছড়িয়ে পড়ে সবখানে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। 'রাজা' - পৃঃ ৩৩৩, রবীন্দ্ররচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড জন্মশত বার্ষিকী
২। জীবন স্মৃতি - পৃঃ ৪৫৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৮
৩। বেদের কবিতা, গৌরী ধর্মপাল, নবপত্রপ্রকাশন, ১৯৮৫
৪। শান্তিনিকেতন , পৃ ১১১, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড।
৫। শান্তিনিকেতন; (পৃ ১১২),
৬। তদেব, পৃঃ ১৫১।
৭। 'তপতী' পৃ ১০৩৯, রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড।
৮। 'তপতী'', পৃঃ ১০৪০
৯। শান্তিনিকেতন, পৃঃ ১২১
১০। শারদোৎসব - পৃঃ ২০৪, রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড
১১। শান্তিনিকেতন - পৃঃ ১১১
১২। রাজা– পৃ ৩০৫। রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠখণ্ড

২৩। তদেব – পৃঃ ৩০৫
২৪। তদেব – পৃঃ ৩০৫
২৫। তদেব – পৃঃ ৩০৫
২৬। শান্তিনিকেতন – পৃঃ ২৬৩।
২৭। রাজা – পৃঃ ৩৫৪
২৮। তদেব - পৃ ৩৫৪
২৯। রাজা – পৃঃ ৩৫৯
৩০। শান্তিনিকেতন – পৃঃ ১১৩
৩১। শান্তিনিকেতন – ৩১৬
৩২। রক্তকরবী – পৃঃ (৬৫২-৬৫৩), রবীন্দ্ররচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড
৩৩। রক্তকরবী – পৃঃ ৬৫৭
৩৪। শান্তিনিকেতন – পৃ ১১৪
৩৫। রক্তকরবী – পৃ ৬৭২
৩৬ ও ২৭। রক্তকরবী – পৃঃ ৬৯০
৩৮। শান্তিনিকেতন – পৃঃ ১২০।
৩৯। তদেব পৃঃ ৩৩২
৪০। অচলায়তন, পৃঃ ৩৭৭, রবীন্দ্ররচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড
৪১। অচলায়তন পৃঃ ৩৮৭
৪২। তদেব পৃঃ ৪১৪
৪৩। মানুষের ধর্ম ঃ পৃঃ ৫৮৩, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড
৪৪। শান্তিনিকেতন, পৃঃ ২৯২
৪৫। চণ্ডালিকা, পৃঃ ১১৪৪, রবীন্দ্ররচনাবলী,ষষ্ঠ খণ্ড
৪৬। তদেব পৃঃ ১১৪৮
৪৭। শান্তিনিকেতন, পৃঃ ৩৩২
৪৮। চণ্ডালিকা, পৃঃ ১১৪৬
৪৯। তদেব, পৃঃ ১১৪৬
৫০। চণ্ডালিকা, পৃঃ ১১৫৬
৫১। তদেব, পৃঃ ১১৫৬
৫২। মানুষের ধর্ম, পৃঃ ৫৯৮
৫৩। নটীর পূজা, পৃঃ ৮৯৫
৫৪। তদেব পৃঃ ৮৯৬
৫৫। মানুষের ধর্ম, পৃঃ ৬০০

স্বদেশী আন্দোলনের ধারা ও রবীন্দ্র কথাসাহিত্য

ডঃ উত্তম পুরকাইত
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

একদিকে রবীন্দ্র জন্ম-সার্ধশতবর্ষ অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের একশ বছর যে আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি অংশ নিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। আবার আন্দোলন থেকে আকস্মিক সরেও দাঁড়িয়েছিলেন স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশী আন্দোলনের একটা বেণীবন্ধন হয়েই যায়। আর সরাসরি যে সমস্ত প্রশ্নবাণ রবীন্দ্রনাথ সযত্নে এড়িয়ে গেছেন রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে আড়ি পাতলে তার যে কিছু প্রতিধ্বনি শোনা যাবে-এ প্রত্যাশার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর পাঠকদের দিয়ে গেছেন। তাই স্বদেশী আন্দোলনের ধারা ও রবীন্দ্র কথাসাহিত্য খুব একটা প্রাসঙ্গিক আলোচনা বলে এসময় মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য নয় এই প্রাসঙ্গি -কতার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বেঁধে বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা। কারণ রবীন্দ্রজীবনের একটি বড় ধর্ম তিনি তাৎক্ষণিক আবেগে বিশেষ কোনো কার্মকাণ্ডে যুক্ত হতেন না। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়া এবং আকস্মিকভাবে সরে দাঁড়ানো-কোনটাই আকস্মিক ব রবীন্দ্রজীবনের শৃঙ্খলাভঙ্গের মত কোনো ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে স্বদেশভাবনার একটা দৃঢ় প্রত্যয় তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল। সে বিশ্বাসের শিকড় ভারতদর্শনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বদর্শন পর্যন্ত বিস্তৃত। আবার তা দর্শন মাত্র নয়, সমগ্র জীবনসাধনা দিয়ে তাঁর স্বদেশী সমাজ গঠনের গুরুতর কর্মভার কাঁধে নিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেও কখনো সে বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে অন্যায়ের মুক্তি পথও খোঁজেননি।

স্বদেশী আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ জাতির জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ হিসাবে চিনেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত স্বদেশী আন্দোলনের সমকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস মেলেনি। সাময়িকভাবে ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ সফল হলেও পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ দিয়েছে ব্যর্থতাই এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি। ১৯৪৭-শে আরও অন্যান্য শর্তে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ মেনে নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোয় অনেক ব্যঙ্গ-কটূক্তিতে বিদ্ধ হয়েছেন কিন্তু এই আন্দোলনের ব্যর্থতার দায় তাঁর উপর বর্তায়নি। বরং সেদিনের মাহেন্দ্রক্ষণকে হারিয়ে পরিপূর্ণ জাতিসত্তা গঠনের ব্যর্থতায় ভারতীয় রাজনীতি যতই ক্ষয়িষ্ণু, দুর্নীতি ও নীতিহীনতায়, ভ্রষ্টাচারে, আঞ্চলিকতায় সংকীর্ণ স্বার্থে দেশের বৃহত্তর মানুষের উপর অত্যাচার করে ক্ষমতালোলুপতায় ডুবছে

তাই রবীন্দ্র স্বদেশভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বাড়ছে। জন্ম-সার্ধশতবর্ষে স্বদেশী আন্দোলনকে সামনে রেখে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে রবীন্দ্র কণ্ঠস্বরের সন্ধান তাই নতুন তাৎপর্য নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হতে পারে।

উনিশ শতকের নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে বাঙালি তথা ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রীতির একটা দেশজ ঐতিহ্য ছিল, কবিয়ালদের গানে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তার মর্মধ্বনি শোনা যায়। সর্বত্র স্বদেশের গুণকীর্তন করা হত, কিন্তু স্বদেশের মুক্তিবাসনা সেভাবে ফুটে উঠত না। ঈশ্বরগুপ্ত আক্ষেপ করেছেন - "জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি/ ধর্মরূপ ভূর্বাহীন হয়ে। / তোমার কুমার যত সকলেই অন্ন হত/মিছে কেন মর ভার বহে।" - ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন , জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতির ধাক্কায় আত্মগরিমা জাতীয়চেতনায় পরিণত হল। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাতে বাঙালির একটা দেশপ্রেমের উদ্‌বোধন হল বটে দেশের সকল শিক্ষিত তরুণ ও প্রাচীন সমাজের মধ্যে কোনো ঐক্যস্থাপন সম্ভব হল না। নব উদ্‌ভূত জাতীয়তাবাদ তখন নানা ধারায় বিভক্ত —

ক. রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসভাকে আশ্রয় করে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভারতচেতনা বা জাতীয়তাবোধের জাগরণ। এই সু-বৃহৎ ভারতচেতনার উদ্গাতাকে যথার্থ অর্থেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতপথিক' আখ্যা দিয়েছিলেন।

খ. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মের সঙ্গে সংঘাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত হিন্দুত্বের জাগরণ বা হিন্দুর জাতীয়তাবোধ। এখানে মজার ব্যাপার এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর দেশপ্রেম বলতে রাজপুতগণের শৌর্য-বীর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আনন্দমঠে ভবানন্দস্বামীর নেতৃত্বে হিন্দু সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেন। অপরদিকে রামকৃষ্ণদেবকে আশ্রয় করে আর এক হিন্দু জাগরণের ধারাও লক্ষণীয়।

গ. সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ও পরবর্তী জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের আগে জাতীয়তাবাদের এই সমস্ত উনিশ শতকীয় ধারাগুলির মধ্যে কোনো ঐক্যই ছিল না, পরস্পর বিরোধিতাতো ছিলই একই ধারার মধ্যেও নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল। সাধারণ জনগণ বৃহৎ-আকারে না হলেও সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহের পাশাপাশি কংগ্রেসের সভা কিংবা হিন্দুমেলা, শিবাজী উৎসবে অল্প-বিস্তর উপস্থিত হতেন। হিন্দু ধর্মের বহুকালের দেবদেবী পূজা সংস্কার ইত্যাদি ফেলে ব্রাহ্মসভায় লোকসাধারণ যেতেন না-ই বলা যায়। শিক্ষায় দীক্ষায় যাঁরা কিছুটা রামমোহনীয় প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী তাঁরাই কেবল ব্রাহ্মসভায় যেতেন। এঁরা কেউ বিদেশী চালচলন বা বিদেশীয়ানায় অভ্যস্ত

হলেও স্বদেশীয়ানা বা স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা কারও কম ছিল না। উদাহরণ দেওয়া যায় ভূরিভূরি। আমরা সে পথে না গিয়ে বরং জাতীয়তাবোধের মূল তিনটি ধারার বৈচিত্র্য ও সংঘাত গুলিকে একবার দেখে নিই। তাহলেই রবীন্দ্র মননে কোন্ স্বদেশীয়ানা দানা বাঁধতে শুরু করে তার হদিস্ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের নায়কদের সময় অনুসারে কণ্ঠস্বরের ভিন্নতা বুঝে নিতেও তা আমাদের সহযোগিতা করবে।

রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কৃষ্ণমোহন মিত্র, নবগোপাল মিত্র-রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধের একই ধারার অন্তর্ভূক্ত হলেও রামমোহনের ভারতচেতনা, দেবেন্দ্রনাথের আত্মবোধের জাগরণ, নবগোপাল, কৃষ্ণমোহনের 'হিন্দুমেলা'র জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্রনাথ এই ভারতচেতনার আবহে লালিত হয়ে স্বদেশপ্রেমকে নিজের মতো করে আত্মীকরণ করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম যখনই সংস্কার পালনের দিকে ঝুঁকেছে তখনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই জাতীয়তাবোধের দূরত্ব বেড়ে গেছে। সংস্কারধর্মের প্রতাপ জানেন বলেই তাঁর রঘুপতি গোমতীর জলে ত্রিপুরেশ্বরীর মূর্তি ভাসিয়ে দিতে পারে। (বিসর্জন) স্বদেশচেতনায় তাই সংস্কারধর্মের অনুপ্রবেশকে কখনোই ভাল চোখে দেখেননি। এ নিয়েও সমকালীন জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ ঘটেছে বহুবার। নিজের ধারণাকে অভিজ্ঞতার কষ্ঠিপাথরে পরীক্ষা করেছেন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে। তাঁর কথাসাহিত্যের নায়কেরা বার বার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে স্বদেশের সত্য দর্শনের সন্ধান করেছেন। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথও ব্রহ্ম উপাসনা ছাড়া অন্যকোনো ধর্মীয় সভা-সংগঠনের কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতে চাননি। ব্রাহ্মসভা পরিচালনার দায়িত্ব অল্পদিনেই ত্যাগ করেছেন। স্বাদেশিকতারবোধ ও ধর্মবোধ একত্রে মিলিত হতে পারে না। কিন্তু তাঁর এই ধারণা যাতে পরাধীনতার যন্ত্রণায় কাতর দেশবাসীর জাতীয় আবেগে ভাঙন ধরাতে না পারে সেজন্যই তিনি সর্বদা থেকেছেন সংযত। কথাসাহিত্যে যাঁরা রবীন্দ্র কণ্ঠস্বরের বাহক তাঁরা আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় হলেও উচ্চকণ্ঠ নয়। নিজ নিজ পরিসরে স্বদেশী সমাজ গঠনের কর্মধারা অব্যাহত রাখেন, কোনো স্বার্থ বা ভীতি তাঁদের অবস্থান চ্যুত করতে পারেনি। কথাসাহিত্যের আলোচনায় প্রসঙ্গটি বিস্তৃত আকারে আলোচিত হবে। এই পর্বে আমরা উল্লেখ করতে চাই, উনিশ শতকের রেনেসাঁ যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সেই আবহে পড়েও কোনো দলভূক্ত না হয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধের গলদ সম্পর্কে তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের সচেতন করেছেন। পাশাপাশি চলেছে বাঙালি তথা ভারতীয় জাতিসত্তা, যা বিশেষভাবে হিন্দুর নয়, মুসলমান বা খৃষ্টানের নয়, ভারতের-তার স্বরূপ সন্ধান এবং ইউরোপের স্টেটের মত কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে সর্বস্ব সঁপে

নয়, স্বদেশ গঠনে ব্যক্তি সমাজের কর্তব্যপালনের সুযোগ কিভাবে রক্ষা করতে হবে তারও পথানুসন্ধান। স্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনাকে এই পথে নিয়ে গেছে। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গুলিতে সকল মানুষের অংশ ছিল না। কিন্তু কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা যে সমগ্র বাঙালির মর্মাঘাতের কারণ হয়ে উঠবে একথা ভেবেই সেই বৃহৎ -আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯০৫ এ পাকাপাকিভাবে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার পূর্বে ১৩ই জুলাই সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র একটি আহবান প্রচার করেন - "সরকার যেরূপ কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতেছেন তাহার প্রেক্ষিতে জনসাধারণের উচিত সমস্ত বৃটিশ পণ্য বর্জন করা, শোকপালন করা, এবং সরকারী কর্তাব্যক্তি ও সরকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করা।" ১৬ই জুলাই খুলনা জেলার বাগের-হাটে বিশাল জনসভায় এরূপ দুটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এরপর ৭ই আগস্ট এবং ২৫শে আগস্ট কলকাতার টাউন হলে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সভাটিতে উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'অব্যবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে যে প্রবন্ধটি পাঠ করলেন সেটির উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান দুটি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত করলেও রবীন্দ্রনাথ বয়কট ও স্বদেশীকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করতে এবং সকলকে করাতে চেয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন-"আমাদের দেশে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথা সম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপর স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্‌যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি তবে তাহার কারণ এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে— আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই , যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের পরিবর্তে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সে জন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে।- - - আমরা ত্যাগের দ্বারা দুঃখ স্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। - - - দেশী জিনিস ব্যবহার করার মধ্যেই যথার্থ সার্থকতা - ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্ম নিবেদন।"— অপরের ক্ষতির কথা ভেবে নিজেদের মঙ্গলবৃদ্ধির সুখ অনুভব রবীন্দ্র

স্বদেশ ভাবনায় কেন তাঁর শিল্পাদর্শেরও পরিপন্থী। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এতটা মতভেদ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, কারণ ভেবেছিলেন এই মতভেদ হয়ত ঘুচে যাবে, স্বদেশী নেতৃত্ব অথবা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী উৎসাহী কর্মীরা তাঁর মনোভাবের যথার্থতা বুঝবেন কিন্তু বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে বাঙালির অন্তর বিচ্ছিন্ন করার যে কুঠার উদ্যত হয়েছে তাকে প্রতিহত করতেই হবে। তাই আবেদন-নিবেদন ভিক্ষাবৃত্তির পথ ছেড়ে যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ঘোষণায় দেশের মন ক্ষিপ্ত অগ্নিপ্লাবী তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষাও কঠোর, কঠিন কিন্তু সংযত-"উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণ স্বরে এই কথা বলে যে, 'তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব', তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না। গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে, ছিন্ন করিতে নহে।" অথবা - "দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা - খোড়া খুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎ কষাঘাত করে, তবে সেই লইয়া কি হাহাকার করিতে হইবে। আমাদের ঘরের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না সেই নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় - করা যায় না।"

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা জাতির যে আত্মবিকাশ ও স্বনির্ভর স্ব-নিয়ন্ত্রিত সমাজের ধারণা রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে অন্যত্র বলেছেন-"হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে লড়াই করিয়া মরিবে না- এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।"— রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশভাবনা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে তো বিশেষ গুরুত্ব পেলই না বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা শোনা গেল অনেকের কণ্ঠে। শিবনাথ শাস্ত্রী 'স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি' প্রবন্ধে স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করলেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও ভারতীয়ত্বের যে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেন তাকে জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আকাশকুসুম কল্পনা বলে সরাসরি বাতিল করে দেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ প্রমথ চৌধুরী আশঙ্কা প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা সমকালের সঙ্গে সজীব সংযোগ রক্ষায় ব্যর্থ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে যেভাবে ত্যাগের দ্বারা অর্জনের কথা বলেন সাময়িক উত্তেজনা ফাঁকিতে তা সম্ভব নয়। সমকালীন নেতৃত্বের এই মনোভাব বুঝেই যে উৎসাহ উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন

থেকে ততোধিক নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, অসংখ্য পত্র এসেছে যে সমস্ত পত্রে স্বাভাবিক সৌজন্যটুকুও রক্ষা করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে সে অপমান বরণ করে নিয়েছেন। সে প্রশ্নগুলি তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেননি। আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেও তাঁর স্বদেশ গঠনের ভাবনাকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণের প্রচেষ্টায় অবিচল থেকেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক উৎক্ষিপ্ত প্রবল ফেনায় তা ঢাকা পড়েছিল বলেই তা দৃষ্টির আগোচরে থেকে গেছে। প্রবন্ধের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ গঠনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার বিষয়টি আলোচিত হবে। এখন ফেরা যাক রবীন্দ্র কথাসাহিত্য অর্থাৎ সমকালীন ছোটোগল্প ও উপন্যাসে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বা কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার আগে ১৩০২ বঙ্গাব্দে রচিত দুটি গল্প 'দুরাশা' 'রাজটীকা'য় পাওয়া যায় উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গ। 'দুরাশা' গল্পে সরাসরি সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ আছে। 'দুরাশা' ব্যর্থ প্রেমের গল্প। উত্তরপ্রদেশের বন্দ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা ভালোবেসেছিল পিতার ফৌজের অধিনায়ক ব্রাহ্মণ কেশরলাল ঠাকুরকে। ব্রাহ্মণ কেশরলাল কারও অন্ন বা দান গ্রহণ করতেন না। "এমন সময় কোম্পানিবাহাদুরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল।" —কেশরলাল সেই লড়াই-এ অংশ নিলেন, নবাবকেও এই লড়াই-এ অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। নবাব কেশরলালকে আশ্বাস দিলেও অর্থ সাহায্যের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলে লজ্জিত নবাব পুত্রী নিজের সমস্ত গহনা কেশরলালের কাছে পাঠালেন, কেশরলাল তা গ্রহণ করলেন। এভাবে নবাবপুত্রীর গহনাদান গ্রহণ করলেও নবাবের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত কেশরলালকে যখন নবাবপুত্রী জ্ঞান ফেরালেন তখন চেতনা ফিরে পাওয়া মাত্র—কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বেইমানের কন্যা, বিধর্মী। মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি।" কেশরলাল শুধু বেইমানের কন্যার সেবা পরিত্যাগ করলেন না, ধর্ম নষ্ট হওয়াকে প্রধান করে তুললেন। জাতীয়তাবোধের সঙ্গে মিশে থাকা এই যে সংকীর্ণ ধর্মবোধ তাকে গল্পকার তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন গল্পের শেষাংশে। প্রত্যাখ্যাত নবাবপুত্রী কখনো কেশরলালকে মন থেকে মুছে ফেলেননি বরং কেশরলালকে ফিরে পাবার প্রত্যাশায় কেশরলালকে অনুসরণ করে চলেছেন। এখানে গল্পের কথককে নবাবপুত্রী শুনিয়েছেন- "কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোনো মতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে

অকস্মাৎ কখনো পূর্বে, কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈঋতে, বজ্রপাতের মত মুহূর্তে ভাঙিয়া পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।" অবশেষে সেদিন নবাবপুত্রী তাকে পাওয়ায় আশা ত্যাগ করলেন যেদিন দেখলেন সেই আশ্চর্য দৃশ্য। মৃত্যুকালে যবনীর জল পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ তাঁর ধর্ম, অভ্যাস ভুলে এক ভূটিয়া স্ত্রী ও ভূটিয়া পৌত্রপৌত্রী গ্রহণ করে সুখী জীবনের পথ বেছে নিয়েছেন। অথচ এই ব্রাহ্মণকুমারকে পাওয়ার জন্য নবাবপুত্রী হয়েও বংশের কোনো ব্রাহ্মণীমাতাকে স্মরণ করে নবাবের অন্দরমহলে হিন্দু আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছেন, কেশরলালের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও সমগ্র জীবন যোগিনীবেশে আপনার প্রেম, আপনার ধর্ম রক্ষা করে এসেছেন। নবাবপুত্রীর কণ্ঠে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ তাই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে থাকা এই সংকীর্ণ ধর্মবোধের তীব্র সমালোচনা করেছেন "যে ব্রাহ্মণ আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়া ছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র।—হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

'রাজটীকা' গল্পটি জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সমকালীন পটভূমিকায় রচিত। ১৩০৫ বঙ্গাব্দেই লেখা গল্পটি দুটি দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ এই দলটির সদস্যদের কীভাবে চিনেছিলেন এবং স্বদেশী ও বয়কট - এই দুই কর্মপন্থা ঘোষিত হওয়ার আগেই এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ তার আভাস দিয়েছেন। তাছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সাহেবিয়ানার প্রবল অনুকরণ দ্বিতীয়ার্ধে এসে যেই সাহেবদের অপমান, ব্যঙ্গের মুখোমুখি হয়েছে অমনি স্বদেশীয়ানার প্রবল ধুয়ো উঠেছে। এ যে সত্য দেশপ্রেম, দেশের জন্য আত্মত্যাগের, আত্মগরিমার উপযুক্ত প্রস্তুতি নয় তাও পাঠককে বুঝিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় প্রবল আগ্রহে পুরোপুরী সাহেব হয়ে উঠতে চাইছিলেন যে প্রমথনাথ তিনি একদিন ইংরেজদের অসৌজন্যে অপমানিত হয়ে—"প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলেপুলে সকলকে ডাকিয়া একটা হোমাগ্নি জ্বালাইলেন এবং বিলাতি বেশভূষাগুলো একে একে আহুতি স্বরূপ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।"—ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রমথনাথ একটা অন্ধ ইংরেজ ব্যঙ্গের আবহাওয়া তৈরী করেছিলেন। রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দুশেখরের ছেলে নবেন্দুশেখর প্রমথনাথের এক কন্যাকে বিবাহ করে ইংরেজ বিরোধী এই আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে শ্যালিকাদের দ্বারা নানা ব্যঙ্গের মুখোমুখি হলেন—" তৃতীয় শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স, স্মিথ, ব্রাউন, টম্‌সন প্রভৃতি প্রচলিত একশত

ইংরাজি নাম লাল সুতা দিয়া সেলাই করিয়া নবেন্দুকে নামাবলি উপহার দিল।"— নবেন্দুশেখরও চাইলেন পিতার মত সাহেবদের হাত থেকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব পাওয়া ব্যবস্থা গোপন করে শ্যালিকাদের মন পেতে। কোনো সাহেবের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে গেলে শ্যালিকাদের বলতেন, "সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি।"- অন্যদিকে সাহেবদের কাছে কংগ্রেসকে মোটা টাকা চাঁদ দেওয়ার কথা গোপন করলেন। শ্যালিকার বন্ধু বান্ধবীদের অনুরোধে নবেন্দু কংগ্রেসকে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন কাগজে ফলাও করে জমিদার নবেন্দুশেখরের কংগ্রেসকে সাহায্যদান ও কংগ্রেসে যোগদানের খবরটা প্রকাশিত হতেই নবেন্দুর 'রায়বাহাদুর' খেতাব পাওয়া দূর-অস্ত হয়ে গেল। এদিকে এই ভণ্ড দেশনায়ককে নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে কি বিপুল উন্মাদনা। এ গল্পে গল্পকারের মনোভাব স্পষ্ট, কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এ এক নীরব সমালোচনা। তিনি ভাল করেই জানতেন কংগ্রেসে যোগদানকারী নবেন্দুশেখরেরা কতখানি স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত।

অতএব একেবারে অরাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথ বা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এমন ধারণা অসম্ভব। দৃষ্টির এই প্রখরতা ছিল বলেই স্বদেশী আন্দোলনের ফাঁকগুলি বুঝে নিতে তাঁর পক্ষে মাত্র তিনমাসই যথেষ্ট হয়েছে। সংকীর্ণ ধর্মবোধ ও ধর্মসংস্কার, সুবিধাবাদী নেতৃত্ব, আত্মপ্রত্যয়হীন মূঢ় বাগ্মীতা, মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কটাক্ষ, দেশের মানুষের দারিদ্র্য, অসহায়তার কথা না ভেবে স্বদেশীর নামে অন্যায় পীড়ন, স্বদেশকে অন্তরে উপলব্ধির অবকাশ না দেওয়া, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ঐক্য গড়ে তোলার ব্যর্থতা রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে আসতে প্রায় বাধ্য করেছিল। তাঁর কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের আচরণে, কণ্ঠে তাঁর না দেওয়া উত্তরগুলি ভিন্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি যে জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ হতে চান সে পথের সমস্ত অন্তরায় তিনি দেখিয়েছেন প্রায় তাঁরই সমবয়সী নায়ক গোরার মধ্য দিয়ে। ১৮৫৭- র সিপাহী বিদ্রোহে যাকে আনন্দময়ী কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তিনি তাঁর লেখকের থেকে বড়জোর তিন বছরের বড়। গোরার মধ্যে উনিশ শতকের হিন্দু জাগরণের প্রচেষ্টা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। জন্মসূত্রে আইরিশ, ব্রাহ্মপিতার গৃহে লালিত অথচ হিন্দু আচার পালনে হিন্দুত্বের আদর্শে বৃহৎ ভারতবর্ষের উত্থান কল্পনায় বিভোর হয়ে ছিল গোরা। গোরাকে সামনে রেখে বিনয়, পরেশবাবু, পানুবাবু এদের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের পরস্পর বিরোধী ধারাগুলোকে একত্র করতে চাইলেন। গোরা শুধু আকারবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষিত নয়, জাতপাত, হিন্দু আচারের সবকিছুকেই তার মহৎ ব্রতের সঙ্গে যুক্ত করতে

চেয়েছিল। গোরা প্রবল বিশ্বাসী হয়ে তর্কে নামলেও তার অভিজ্ঞতা হিন্দুর দ্বারা ভারত-ঐক্যের স্বপ্নকে বারবার বিপাকে ফেলেছে। চরঘোষ পুরের অভিজ্ঞতা, কারাবরণের অভিজ্ঞতায় জাতপাত, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক গোরাকে বিচলিত করেছে। উপন্যাসটি ভাল করে পড়লে বোঝা যায় গোরার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশভাবনার আদর্শটিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাটিতে যাচাই করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিজ্ঞতার কোষ্ঠীপাথরে যে মূল্যবান ধারণাকে পেয়েছিলেন, আমরা যা আগে উল্লেখ করেছি অর্থাৎ ভারতের মাটিতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান লড়াই করে শেষ হবে, না এক সামঞ্জস্য হবে, যে ভারতবর্ষ অহিন্দুর হবে না, বিশেষভাবে হিন্দুর হবে। গোরার ভারত অন্বেষণ ঠিক এখানে এসেই মুক্তি খুঁজে পেয়েছে-"আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আজ আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।—আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নয়, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।" জন্মরহস্য উন্মোচিত হওয়ার পর পরেশবাবুর কাছে গোরার এই স্বীকারোক্তি আকস্মিক মনে হতে পারে কিন্তু সমকালীন রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা, যা স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি তা উদ্ধৃত করলে গোরার মুক্তিকে তাৎক্ষণিক মনে হবে না। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক স্বদেশী আন্দোলনে যে জটিল আবর্ত তৈরী করেছিল এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে অনেক পরে তিনি প্রবন্ধে লিখেছেন বটে কিন্তু সেগুলি আগেই গোরার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। যাই হোক, গোরার মন্তব্যের সঙ্গে ১৯৩১-শে লেখা 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধের কিছুটা অংশ মিলিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে — "মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে।— মানুষকে ঘৃণাকরা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই।"— বস্তুতই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে কিছু সংখ্যক মুসলমান কর্মী জননেতা বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করায় তারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। গোরার পরাজয় ও মুক্তির আড়ালে স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের নিঃশব্দ অপসরণের

সমস্ত কারণ লিপিবদ্ধ আছে।

'গোরা' শেষ হয়েছে ১৯০৯ এর মধ্যেই, তখন কার্জন বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করেনি। অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রকাশ্য ধারা থেকে সরে দাঁড়িয়ে তাঁর দেশভাবনাকে কার্যকরি রূপ দিতে নিভৃতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলেও তার লক্ষ্য শুধু বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ নয়, এই আঘাতের ভিতর দিয়ে ভারতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করা, জাতীয়তাবোধের উন্মাদনাকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা। গোরা ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দময়ীর মধ্যে ভারতের মহৎ-ধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। অনেক ত্যাগের মূল্যে গোরা চিনেছে তার মাকে, দেশকে। গোরার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে থামলেও চন্দ্রনাথবাবু ও নিখিলেশের মধ্যে দিয়ে তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'ঘরে-বাইরে' স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস। ঔপন্যাসিক বিমলার ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্ব বা শক্তির মানদণ্ডের কথা বললেও সন্দীপের বাগ্মিতার বিপরীতে নিখিলেশের স্থির বিশ্বাস অনেকটাই রবীন্দ্র আদর্শের প্রতিরূপ। এর আগেই আমরা দেখেছি বয়কট ও স্বদেশী ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব। নিখিলেশের কর্মপন্থা, চন্দ্রনাথবাবুর উপদেশের মধ্যে সেই মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেছে। এই উপন্যাসে বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছে সন্দীপের বাগ্মিতা। স্বদেশী-আন্দোলনের ভ্রান্তিগুলির মধ্যে এই মূঢ় আত্মাভিমান, আত্মপরতা, আবেগসর্বস্ব উন্মত্ততা দেশের পক্ষে উগ্র ফেনিল মাদকতার যোগান দিয়েছিল মাত্র। বিমলাকে দেশমাতৃকার বেদীতে বসিয়ে তার স্তোত্রপাঠ করে তাকে ক্ষণিক ভোলাতে সন্দীপ সক্ষম হলেও বিমলা তার ফাঁকি ঠিক বুঝতে পেরেছে। নিজের সমস্ত গহনা দেশমাতৃকার সেবায় সন্দীপের হাতে তুলে দিলেও বিমলা দেখেছে সন্দীপ কীভাবে পনেরো-ষোল বছরের অমূল্যকে জোর করে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে ভীরুর মত নিজেকে বাঁচাতে তৎপর হয়েছে। অপরদিকে নিখিলেশ সন্দীপের মত নায়কের নেতৃত্বে দেশ সেবার ব্রতকে মনে করে 'বিব্রত করবারই ব্রত', এরা দেশে 'মায়ার, তাড়িখানা বানিয়ে তোলার আয়োজন করছে।' 'তাঁর আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় উক্তিতে স্পষ্টতই রবীন্দ্র অন্তরের প্রতিধ্বনি "আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে পারিনি, এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব চাই কিম্বা পুলিশকে ভয় করি। পুলিশ ভাবছে, ভিতরে আমার কু-মতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালো মানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি। কেননা আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না চীৎকার করে মা বলে, দেবী বলে,

মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয় তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যের উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ।" চন্দ্রনাথবাবুর কথায় বোঝা যায় একদিন রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী ও বয়কটকে যে মহৎ আত্মবোধের মন্ত্র হিসাবে ভেবে উৎসাহিত হয়েছিলেন-"এ যে শক্তি। এ যে সম্পদ। ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে, ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্, ইহাকে বক্ষের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে"--সমকালীন আন্দোলন সেই সত্যকে কণামাত্র গ্রহণ না করে প্রজাদের উপর যে অন্যায় পীড়ন শুরু হয়েছে তারই স্পষ্ট প্রতিবাদ এখানে উচ্চারিত—"দেশ বলতে তো মাটি নয়, এই সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ! এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন—আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। কিন্তু এই গরীবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।" স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের দমন-পীড়নের ফলে যে স্বদেশী আন্দোলনের ভিত দুর্বলই হয়েছে, জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়নি বরং ভেঙেছে-একথা প্রায় সমকালীন ১৯০৮-এ লেখা 'সদুপায়' প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন "তাহাদিগকে আমাদের মনের মত কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না, কিন্তু তাহাদের মন খোয়ালাম। ইংরেজদের শত্রুতা সাধনে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।" অন্যত্র বলেছেন- "যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচ প্রবৃত্তি হইবে না।" — চন্দ্রনাথবাবুর উপদেশ নিখিলেশের আদর্শ হয়েছে বলেই নিখিলেশ এমন সংযত ও সাহসী। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় যখন সত্যই হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধেছে তখন বাগ্মী সন্দীপের দেখা নেই কিন্তু নিখিলেশ প্রাণ দিয়ে হলেও সেই দাঙ্গা থামানোয় ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

স্বদেশের প্রতি, পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বের প্রতি-রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজের অন্যায় পীড়নকে কোনো অবস্থায় মেনে নেননি, নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়েই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনের উপর ইংরেজদের দমনপীড়ন যখন চরমে উঠেছে। স্কুল কলেজ থেকে আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ছাত্রছাত্রীদের

করা হচ্ছে, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে ছাত্রেরা পীড়িত হচ্ছে তখন সরকারী নিপীড়নের শিকার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ১৯০৬-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী একটি জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি আবেদন' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন-"বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বরণ করিয়া লইল তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে"—রবীন্দ্রনাথ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেও রাজরোষে পীড়িতদের পাশে সর্বদা থেকেছেন। এ ব্যাপারে ইংরেজদের রক্তচক্ষুর ভয় তাঁর কিছুমাত্র ছিল না। অরবিন্দ পোদ্দার 'রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন দু-একটি ঘটনার। যেমন-"খুলনা জেলার সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেন স্বরচিত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেন, নাম 'হুঙ্কার' এবং রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারে এই কাব্যগ্রন্থটি তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে হীরালালের বিচার এবং ছ-মাসের কারাদণ্ড হয়। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে হীরালালকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। পরে পুলিশের অনিবার্য হস্তক্ষেপ ঘটলে তিনি তাঁকে জমিদার সেরেস্তায় অন্য পদে বদলি করেন।—আর কয়েক বছর বাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রামীণ পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অতুলচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মীকে নিয়োগ করেন।"

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় অনেক পরে লেখা আরও কয়েকটি গল্পে। 'নামঞ্জুর'(অগ্রহায়ণ- ১৩৩২) গল্পে স্পষ্টতই স্বদেশী আন্দোলনের দুই প্রজন্মকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। গল্পের কথক বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে অবতীর্ণ বিদ্রোহী নায়ক; আন্দামানের জেলখানা পর্যন্ত পাড়ি দেওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও গ্রহের গুণে এপারের হাজতেই প্রথম পর্বের ইতি ঘটাতে পেরেছেন। জেলখানায় তাঁর সতীর্থ ছিলেন উল্লাসকর-কানাই-বারীণ-উপেন্দ্র প্রমুখেরা। কথক গল্পটি শুরু করেছেন তার জীবনের মধ্যপর্ব থেকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অন্দোলনে অংশ নিয়ে বেশ দীর্ঘ জেলবাসে কাটিয়ে আশ্রয় পেলেন দূর-সম্পর্কের কোনো এক পিসিমার কাছে। পিসিমার বক্তব্য বলতে পালিতা কন্যা অমিয়া; পালিতা কারণ কন্যাটি নাকি পিসিমার স্বামীর ঔরসেও পিসিমার নয়। পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার তার গর্ভেই অমিয়ার জন্ম। স্বামীর মৃত্যুর পর এই কন্যাকেই পিসিমা লালন করেছেন। কথক দাদা এবং পালানো বোন অমিয়া স্বদেশী আন্দোলনের দুই যুগের প্রতিনিধি। অবশ্য শুধু এরাই নয়, গল্পকার যেমন কথকের সঙ্গে বিখ্যাত বিপ্লবীদের স্বপংক্তিভুক্ত করেছেন তেমনি অমিয়াকে

কেন্দ্র করেও এসেছে আরও অনেকে—অনিলসহ অমিয়ার কলেজের বন্ধুরা। কথক নিজেই পাঠককে জানিয়েছেন-"আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাইনি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে, তাছাড়া সেই অগ্নিকাণ্ডের খেলা বন্ধ।"—কথকের এই সূচনা বাক্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে গল্পকার এই আন্দোলনের 'লঙ্কাকাণ্ডের' সূচনা থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত একটা ইতিহাস মেলে ধরতে চাইছেন। যে ইতিহাস আসলে ব্যর্থতার। অথচ কথক কখনো আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়াননি। ফাঁসির দোরগোড়া থেকে ফিরে এসে আকস্মিক রায়-বাহাদুর পিতার অবর্তমানে বিপুল সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছিলেন। পশ্চিম থেকে পিসিমা, অমিয়া, দুজনকেই এনেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু সম্পত্তির কিংবা প্রজাপতির বন্ধন নায়কের গ্রহে নাকি ছিল না। তাই অনায়সেই কন্যাপক্ষের বিশপঁচিশ হাজার দেশ সেবার সংকল্পে তিনি ত্যাগ করে পিতামহ ভীষ্মের মত মহৎ-চরিত্রের হতে চেয়েছেন। কথকের এই বিবরণে গল্পকার পাঠককে হয়ত বুঝিয়ে দিয়েছেন-স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত দেশব্রতীদের ত্যাগের মাহাত্ম্য অপেক্ষা ত্যাগের অহংকার ছিল। সম্পদের মোহে আটকা পড়েনি কথক, আন্দোলনের দ্বিতীয় পালায় নেতৃত্ব হারিয়েছেন কিন্তু আন্দোলনের নেশা ত্যাগ করতে পারেনি। তাই খদ্দর প্রচারকারিণী বাঙালি মহিলার সম্মান রক্ষাতে পুলিশ সার্জনকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় জেলখানাতেই গেলেন নায়ক। এবার মেয়াদ ফুরানোর আগে ছাড়া পেলেও গৃহবন্ধনহীন জীবনে পিসিমার স্নেহের ইন্দ্রজালে কাবু হয়ে মনের কঠোরতা রক্ষা করতে পারলেন না। বাহ্যত আড়াল করতে চাইলেও স্নেহের কাঙালিপনাকে আর জোর করে ঢেকে রাখা গেল না। বিদ্রোহী নায়ক শেষে গলার তেজ হারিয়ে সেবার বন্ধনে আত্মসমর্পন করে অগ্নিযুগের পরিসমাপ্তি ঘটালেন।

অপরদিকে বিপ্লবী দাদার আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা কলেজের ভাল ছাত্রী অমিয়াও হঠাৎ অসহযোগের অসহ্য আবেগের নবতর হাওয়ায় কলেজ ত্যাগ করে হয়ে পড়ল যুগলক্ষ্মী। ভিড়ের মধ্যে বক্তৃতা দিতে, অপরিচিতের বাড়িতে চাঁদা আদায়ের ঝুলি নিয়ে ফিরতে যুগলক্ষ্মীর ভক্ত জুটে গেল অনেক। অনিল এদের মধ্যে অন্যতম। অমিয়াকে সে দেবীর আসনে বসিয়াছে ঠিক 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপের মত। অর্থাৎ গল্পকারের বিশ্বাস স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়েও সন্দীপেরা এসেছে। এসেছে দেশসেবা যুগলক্ষ্মীর ভক্তি সেবায় নিযুক্ত হয়ে ধন্য হতে। তবে সন্দীপ পালিয়েছিল, অনিলও পালিয়েছে। সন্দীপ পালিয়েছিল বিমলার হাতে ধরা পড়ে, দাঙ্গায় প্রাণরক্ষার ভীরুতা নিয়ে। অনিলের পলায়ন একটু ভিন্ন রকমের হলেও লেখকের অভিজ্ঞতায় নতুন নয়। অনিল দেবীকে গৃহমন্দিরে প্রতিষ্ঠা দেবার সংকল্প নিয়ে এসেছিল অমিয়ার বিপ্লবীদাদার কাছে। কথক নায়ক স্বদেশী

[illegible] দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে অভিজ্ঞতায় অনিলকে চিনতে ভুল করেনি। অমিয়াকে স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠা করে, তার অনুমতি নিয়ে অনিল যুগলক্ষ্মীর গৃহসেবায় নিযুক্ত [illegible] তৎপর হয়েছিল কিন্তু কথক নায়ক যেইমাত্র অমিয়ার জন্মপরিচয় অনিলের কাছে প্রকাশ করল অমনি ভণ্ড পুরোহিত পালানোর পথ পেলে না। নতুন যুগের ভণ্ড [illegible]দের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অমিয়া ফিরে গেছে তার কলেজের অসমাপ্ত পাঠ সম্পূর্ণ করতে। স্বদেশী আন্দোলন পরাধীন ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক অন্দোলন [illegible] উঠতে পারেনি এই আচার সংস্কার, অস্পৃশ্যতার বহপ্রাচীন আগল ভাঙতে না পেরে।

শেষ পর্বের যেক'টি গল্পে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ এনেছেন প্রায় প্রত্যেকটিতেই এই আন্দোলনের সংকীর্ণতাকে বেশি বেশি দায়ি করেছেন। 'বদনাম' (১৯৪১) গল্প সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশ সেবায় পুরুষতন্ত্রের একাধিপত্যের [illegible] বিপরীতে নারী ব্যক্তিত্বের স্বাধীকার প্রচেষ্টা। ইন্‌স্‌পেক্টরের স্ত্রী হয়েও গল্পের নায়িকা সদু এক স্বদেশী ডাকাতকে গোপনে সহযোগিতা করে। স্বামীকে কৌশলে শোনায়- 'আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মত একটা কিছু করতে পারি তাহলে আমাদের [illegible], এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে, হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি [illegible] কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব [illegible] যত জমানো আস্তাকুঁড়।" অবশেষে স্বামীর কাছে সমস্ত স্বীকার করে মাথা পেতে [illegible] নিতে দ্বিধা করেনি সদু। জাতীয় আন্দোলনে নারীদের অগ্রাধিকারের প্রসঙ্গটি যেমন রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায় তেমনি তাদের সংস্কারবোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। যেমন 'সংস্কার' গল্পের কলিকা। স্বদেশী দলভুক্ত কলিকার সংস্কার তার স্বামী খদ্দর পরেন না তাই তিনি দেশকে প্রকৃত ভালবাসেন না। অথচ গল্পের শেষে দেখা যায় পথে একদল এক বৃদ্ধ মেথরকে মারছে দেখে কলিকার স্বামী যখন তাকে উদ্ধার করতে যায় তখন কলিকা বলে-"করছ কী, ও যে মেথর।' আমি (স্বামী) বললুম। [illegible] না মেথর, তাই বলে ওকে অন্যায় ভাবে মারবে? / কলিকা বললে, 'ওরই [illegible] রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হত।'/আমি বললুম 'সে আমি বুঝি নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।'/কলিকা বললেন 'তা [illegible] এখনই এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না - হাড়িডোম

হলেও বুঝতুম, কিন্তু মেথর!"-চার অধ্যায়ের' এলাকে দেখা যায় বিপ্লবী আন্দোলনে সরাসরি অংশ নিতে। এলা আর নামঞ্জুর গল্পের অমিয়ার মধ্যে একটা পার্থক্য স্পষ্ট হয়- অমিয়া অনলের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল কিন্তু এলা অন্তর প্রস্তাবে রাজী না হয়ে জানিয়েছে-দেশের কাছে সে বাগদত্তা, সংসার ধর্মে সে আবদ্ধ হবে না এই প্রতিশ্রুতি সে ইন্দ্রনাথের কাছে নিয়েছে। যদিও এলার পরিণতি বিপ্লবী দলের অন্ধকূপেই ঢাকা পড়েছে। মোটকথা রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বদেশী-আন্দোলনের ফাঁকি, কতকগুলি শিল্প-উপাদানের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে।

শেষকথা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিকভাবনা কখনো মেলেনি। দেশকাল সচেতন রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশিক শাসনকালে ইংরেজ শাসনকে স্বদেশ বিপ্লবের পটভূমিকায় মনযোগ প্রয়োজনীয়তার বিচারে দেখতে চেয়েছেন একদিকে, অপরদিকে তিনি ভারতবর্ষের মুল লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছিলেন বহু বিচিত্র এই দেশের বিস্ময়কর ঐক্যকে। যে ঐক্যকে তিনি বিশ্বের বুকে এক মহামানবের মিলন ক্ষেত্র হিসাবে ভারতবর্ষকে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। এই দুই ধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা বিপ্লবী-আন্দোলনের প্রায় বিপরীত স্রোত বলে সমকালীনদের কাছে মনে হয়েছিল। এজন্য অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো দায়ী হতে পারেন। বৃহৎ -লক্ষ্যের স্বপক্ষে কখনো কখনো তাঁর ইয়োরোপ স্তুতি সেই ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও বিস্তর আলোচনার অবকাশ আছে। আমরা বরং তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতাটি দিয়েই এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারি—

'হে মোর চিত্ত, পুন্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।।'

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা

পিউ ভট্টাচার্য্য
শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি পূর্ত্তিতে তাঁর উদ্দেশ্যে যে ইংরাজী উৎসর্গ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার দুটি অত্যন্ত সারগর্ভ রচনা এসেছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও আইরিশ কবি ইয়েটস্ এর কাছ থেকে। পণ্ডিতজী নিজে জাতীয় নেতা, তিনি কবির কাব্যের রাষ্ট্রনৈতিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন যে কবি দেশকে স্বাধীনতাসংগ্রামে মুক্ত করেছেন, জাতি তাঁর কাব্যে অপরূপ প্রেরণার সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু জাতীয়তা যখন জীবনের চরম আর্দশ হয়ে পড়ে তখন তা মানব জীবনকে কত পঙ্গু করে ফেলে, তাও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। জাতীয়তার মহত্ব ও সংকীর্ণতা উভয় ছবিই তিনি এঁকেছেন। কবি ইয়েটস্ বলেছেন যে, প্রাচীন সাহিত্য শিল্পকলার বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের গুণ এই যে তা জীবনের পরিপূর্ণতার মূর্তি আঁকে, জীবনের মধ্যে যা আর্বজনা, যা কেবলমাত্র যান্ত্রিক, যা প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে ব্যহত করে, রবীন্দ্রনাথ তাকে পরিহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের আবর্জনা ও যান্ত্রিকতা দূর করে তাকে পরিপূর্ণ, মহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত করতে চেয়েছেন। তাই বিদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আগে তিনি স্বদেশী সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের শৈবালকে দূর করতে চেয়েছেন। হিন্দুধর্ম ভগবানকে খণ্ড খণ্ড করে পেতে চেয়েছিল। দীর্ণ লোকাচারের জীর্ণ গলিত শবকে সে প্রাণের ঠাকুর বলে পূজা করতে চেয়েছিল। নানা বাধানিষেধের জঞ্জালে যারা মানুষকে নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তারা সমগ্র জাতীয় জীবনকে শুধু ক্ষীণ ও ক্ষুণ্ণই করেনি - সমগ্র দেশের একতাকেই বিনষ্ট করেছে। অপমানে সকলের সঙ্গে সমান হয়েছে।

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়।
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।। - সঞ্চয়িতা

যখনই কবির উদার কল্পনা - সংকীর্ণের সঙ্গে বিরাটকে সংযুক্ত করেছে, সেখানে শুধু প্রাত্যহিকের ক্ষুদ্রতাকে বিদ্ধ করেই কবি ক্ষান্ত হন নি, তিনি অপার, উন্মুক্ত, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের কল্পনাও করেছেন । তাঁর কল্পনা ক্ষুদ্র থেকে অসীমত্বে, সান্ত থেকে অনন্তে পরিক্রমা শুরু করেই তা শ্রেষ্ঠসাহিত্যকীর্তি হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের জন্য কবি এক

অপরূপ স্বর্গলোক সৃজন করেছেন।

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা-
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"- রবীন্দ্ররচনাবলী ৫ম খণ্ড

শেলি মানবজাতির জন্য নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই পরিকল্পনার অপরিসীম মহিমা আছে - কিন্তু তা অলীক স্বপ্ন বলে মনে হয়। আবার টেনিসনের কাব্যে স্বদেশ আদর্শের যে মূর্ত্তি দেখতে পাই - তাতে বাচ্য অর্থের অন্তরালে কোন ব্যঞ্জনার প্রতীতি হয় না। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে বাস্তবজীবনের বর্ণবৈচিত্র্য আছে আবার অপরূপের রেখাপাতও হয়েছে।

আচারের শৈবালে জাতীয় জীবন দিনদিন শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। আমরা শুধু দিনদিন বাক্‌পটু ও কর্মকুণ্ঠ হয়ে পড়ছি। আমাদের দীনতা ও জড়তার মধ্যেও সন্তোষ আছে, দুর্বল আত্মপ্রসাদে আমরা আরও কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছি। এই নির্জীব কর্মপরাঙ্মুখ জাতিকে কবি জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন- এ জাতির মূল দোষ আলস্য নয়, ভীরুতা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী কবিতার প্রধান মন্ত্র অভয়ের মন্ত্র।

" আগে চল্, আগে চল্, ভাই
.....
বিপুল এ ধারা চঞ্চল সময়
মহাবেগবান মানব হৃদয়
যারা বসে আছে, তারা বড় নয়
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই
আগে চল, আগে চল, ভাই - রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড

কবি দেখছেন, যে জীবনসংগ্রামে সব জাতিই অগ্রসর হচ্ছে। শুধু নির্বীর্য ভারত পশ্চাতে পড়ে আছে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে অবসন্ন ভারতবাসী গভীর ঘুমে আছন্ন। তাই জাতীয় মহাসম্মেলনের জন্য তিনি যে মহাসঙ্গীত রচনা করলেন তার মধ্যেও ব্যথার সুর রয়ে গেল—

" দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী

আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরী।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
সেকি রহিল লুপ্ত সবজন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্মভার, মিলি সবার সাথে।

- রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড

স্বাধীনতাকে মানুষের জন্মগত অধিকার বলে কবি মনে করেছেন , এবং ভারতকে সেই অধিকার পেতে হলে নিঃসঙ্ক চিত্তে তা কামনা করতে হবে। 'দেশের উন্নতি', 'দুরন্ত আশা', প্রভৃতি কবিতায় কবি আত্মপ্রত্যয়হীন, পরপদলেহী জাতির দীনহীনতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে জাতিকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন—

"আত্মঅবিশ্বাস তার নাশো কঠিন ঘাতে।
পুঞ্জিত অবসাদ ভার হানো অশনিপাতে।
ছায়া ভয় - চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে।
জাগ্রত ভগবান হে।" -রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খন্ড

কবির বিশ্বদেবতা জাতিকে বলছেন—

"ওরে ভীরু, ওরে মূক, তোলো তোলো শির
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

-রবীন্দ্র রচনাবলী নবম খন্ড

কবি 'সুপ্রভাত' কে আহ্বান করেছেন-

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।
.....
এসেছে প্রভাত এসেছে
তিমিরান্তক শিবশঙ্কর।
কি অট্টহাস হেসেছে।"

জাতি নির্ভীক হলেই বিশ্বে সংগ্রামে সে অগ্রসর হবে। অতীতের মোহকে প্রশ্রয় দিলেও এদেশের প্রাচীন আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ বরণ করেছেন। সেই আদর্শ , কালক্রমে

বিকৃত, জরাজীর্ণ হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে প্রকৃত মহত্ব রয়েছে। বিদেশের অনুকরণকে তিনি ঘৃণা করে কবিতা লিখেছেন এবং দৈন্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের মহনীয়তাকে চিনে নিয়েছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও অবদানে যে সব মহীমময়ী কাহিনী পেয়েছেন, তাদের ও তিনি ' কথা ও কাহিনীতে' রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন, ' নৈবেদ্য ' কাব্যগ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন- ইউরোপে যে বণিকসভ্যতা স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অপঘাত মৃত্যু হবেই। রক্তকরবী, মুক্তধারা, অচলায়তন পড়লে বোঝা যায় - রবীন্দ্রনাথের আদর্শ শুধু রাজনৈতিক ও সমাজিক স্বাধীনতা নয় - মানবতার উন্মুক্ত,পরিপূর্ণ, অনন্ত স্ফূর্তি। তিনি বলেছেন—

আছ জাগি,
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন
সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান, আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছো দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।"

বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের উদ্দেশ্যে তিনি যে কবিতা লিখেছেন তার মধ্যেও এই সুরটি ফুটে উঠেছে। তাদের মধ্যে মানবতার অদম্য প্রকাশলালসা কবিকে মুগ্ধ করেছে। তাই তিনি এদের প্রচেষ্টাকে তুলনা করেছেন অন্ধকার ভেদী সূর্যালোক, পিঞ্জরবদ্ধ পাখির গান ও ফোয়ারার উন্মুখ স্রোতের সঙ্গে।

রাষ্ট্রশক্তি নিজেকে ছাড়িয়ে উঠতে না পারলে তা জীবনধারার গতিকে রুদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ' ঘরে বাইরে' ও 'গোরা' উপন্যাসে। তাঁর স্বদেশচিন্তা আসলে একীভূত বিশ্বমানবতাবাদেরই আরেক পিঠ। 'প্রতিনিধি' কবিতায় দেখি শিবাজী রাজ্য শাসন করেছেন সন্ন্যাসী , ভিখারী রামদাস স্বামীর প্রতিনিধি হিসাবে। শিবাজী উৎসব উপলক্ষে কবি যে কবিতা লিখেছেন, তাতেও তিনি দেখিয়েছেন যে শিবাজীর প্রচেষ্টা মূলতঃ ধর্ম প্রচেষ্টা —

" এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।" (সঞ্চয়িতা)

ভারতবর্ষে বহু ধর্মের সমন্বয়, বহু বিভেদের নিরসন হয়েছে- প্রাচীন ভারত বহুর মধ্যে এককে দেখেছিল। যে আদর্শের গৌরব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে তা বিশদ ভাবে ধর্মের আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ, বিশ্বমানবতার আদর্শ।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি।
ত্যাজিতে মুকুট ,দণ্ড , সিংহাসন, ভূমি
ধরিতে দরিদ্র বেশ

.....

ভোগেরে বেঁধেছ দৈন্যে করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল। (সঞ্চয়িতা)

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে বুদ্ধের জীবনী এবং বৌদ্ধ কাহিনীর দ্বারাই কবির চিত্ত সর্বাপেক্ষা বেশী আলোড়িত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে গৌড়ে , ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, এবং ভারতবর্ষের বাইরে। কিন্তু যেসব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের কথা লিখেছেন তাতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সাম্রাজ্যবিস্তারের যোগসূত্রটুকু পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর কাছে বুদ্ধের বাণী নিষ্কাম ধর্মের বাণী, অমেয় প্রেমের বাণী। কবি বলেছেন —

'সে মন্ত্র ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত কত শতাব্দীর সংসার যাত্রারে—
শুভ আর্কষণে বাঁধি তারে
একধ্রুব কেন্দ্র সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে
এক ধর্ম, এক সঙঘ, এক মহা গুরুর শক্তিতে। '

(রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড)

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা তিনি আরম্ভ করেছেন দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞানের অন্ধকার নিয়ে, তিনি বলেছেন—

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এইসব শ্রান্ত শুষ্ক বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।' (সঞ্চয়িতা)

কিন্তু ধীরে ধীরে দেশের সীমাবদ্ধ আদর্শকে অতিক্রম করে কবি বিশ্বচেতনা বিশ্বমানবতার স্পন্দনে নিজের হৃৎস্পন্দনকে মিলিয়ে দিয়েছেন। অশুভের বিরুদ্ধে শুভের, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে নৈতিকতার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয় ঘোষণা করেই তিনি বলেন যে —

" নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিছে নিশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

.....

তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত
ঘরে ঘরে।
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।" (সঞ্চয়িতা)

যে জীবনদেবতাকে তিনি আহ্বান করেছেন তিনি ভারতবর্ষের বিশিষ্ট দেবতা নন, তিনি 'বিশ্বদেবতা,' রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেশ নিজের খণ্ডতাকে অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

যে চিরসাথীকে কবি 'ভারতভাগ্যবিধাতা' বলে আহ্বান করেছেন, তিনি বিশ্বদেবতা, দেশ দেশ নন্দিত করে মন্ত্রিত তাঁর ভেরী।

'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হুণ দল, পাঠান মোগল
একদেহে হল লীন। (সঞ্চয়িতা)

কবি যে 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার কথা লিখেছেন, তা বিশেষভাবে অসীমের অভিমুখে মানবহৃদয়ের প্রাণ চঞ্চল অভিসার, যে যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীর উল্লেখ করেছেন, তা অনন্ত ভারতাত্মার কোষে কোষে প্রবাহিত প্রাণময়তা, দেশ দেশ নন্দিত চিরসাথী। এই নিবন্ধটি শেষ করি রবীন্দ্রনাথেরই এই পংক্তি ক'টি বলে

'বিশাল বিশ্ব চারিদিক হতে
প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটী কর হানিছে।

.....

পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমায় টানিছে। রবীন্দ্র রচনাবলী, চর্তুদশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথের সবুজপত্র পর্বের নারী ভাবনা

ডঃ মমতাজ বেগম
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

রবীন্দ্র সাহিত্য বিশেষতঃ ছোটগল্পে তাঁর নারী ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে, নানারূপে। জীবনদেবতার অন্বেষণ করতে গিয়ে যে সত্যকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই সত্যের প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন মানুষের মাঝে। বিশেষতঃ সমাজে, সংসারে যারা দুর্বল অসহায় রূপে চিহ্নিত সেই নারীর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন 'মানুষের' রূপ। আমার আলোচনার বিষয় ১৯১৪ এর সবুজপত্র পর্বের গল্পগুলি।

'রাঁধার পরে খাওয়া, খাওয়ার পরে রাঁধা
এক চাকাতেই বাঁধা।' (পলাতক, মুক্তি, পৃঃ ৫৩২)

নারীকে তার গতানুগতিক জীবন থেকে বের করে আনার জন্যই যেন রচিত হয়েছে সবুজপত্রের গল্পগুলি। এই গল্পগুলিতে নারীর গতানুগতিক জীবন যাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর শোনা যায়, শোনা যায় মানবীর কণ্ঠস্বর। 'বোষ্টমী', 'অপরিচিতা', 'স্ত্রীর পত্র' 'হৈমন্তী' প্রভৃতি গল্পের নায়িকারা প্রতিবাদ করে সবক্ষেত্রে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল না হলেও প্রতিবাদ করেছে জোরালো কণ্ঠে। যে নারীর কোন নিজস্ব পরিচয় ছিল না, যে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ দেবী', কিন্তু কে সে? তার পরিচয় দিয়ে। 'পলাতকা' পর্বে গিয়ে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে সেই নারী বলতে পারলো–

'*আমি নারী, আমি মহীয়সী*
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায়
নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যাতারা ওঠা
মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৫৩২)

সময়ের তাগিদে যে 'সবুজপত্র' পত্রিকার জন্ম হয় সে পত্রিকা অবশ্যই চিনিয়ে নেবে জীবনকে, সাহিত্যকে, সর্বোপরি মানুষকে। সময়ের অগ্রবর্তী মানুষ রবীন্দ্রনাথ নতুন সময়ের জন্য নতুন বিষয় ও নতুন মানুষকে আনলেন; এতদিন যে মানুষ 'মানুষের' মর্যাদা পাবার যোগ্য ছিল না তাকে উন্মোচিত করলেন। সময়োচিত আধুনিক চরিত্র হিসাবেই দেখা দিল 'সবুজপত্র' পর্বের নারী চরিত্ররা। ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীনতার বিরুদ্ধে চলিষ্ণু উদিয়মান শক্তির অগ্রগতি দেখানো হল। অন্ধ প্রতাপমত্ততার ও স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গে

অবিচলিত প্রেমের বাহন হয়ে উঠতে পেরেছিল সবুজপত্রের নারীরা। এই পর্বে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির প্রতিটি নারী মুক্তি খুঁজেছিল আপন স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে।

নারীবাদী স্থূল ভাবনা থেকে নয়, নারীকে মানুষ হিসাবে দেখার চেষ্টাতেই তার নতুন হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার কারাগারে বন্দী মানুষের ব্যাকুল ক্রন্দন লক্ষ্য করা যায় যেমন তেমনি আছে আত্ম অন্বেষণ। প্রায় প্রতিটি নারীই নৈঃসঙ্গপীড়িত, অথচ মরণ নয় তারা বাঁচার লড়াইয়ে উৎসাহী। ' দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার মত এরা মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি অন্বেষণ করেনি। জীবনের গতানুগতিক চাকায় বাঁধা থেকে অর্থহীন, স্বাদহীন, বোধহীন, সংবেদনহীন যান্ত্রিক কালযাপন থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল, 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তী, 'অপরিচিতা'র কল্যাণী, 'বোষ্টমী' গল্পের সর্বক্ষেপী আনন্দী,'পয়লা নম্বরের অনিলা সকলেই ব্যতিক্রমী চরিত্র। প্রায় প্রতিটি গল্পের পুরুষদের 'আমি' সত্তা নারীর কাছে নমনীয় হতে বাধ্য হয়েছে। হৈমন্তীর স্বামী, অপরিচিতার অনুপম, পয়লা নম্বরের অদ্বৈতচরণ কেউই নিজের অন্তরের সত্যটাকে গোপন করতে পারেনি। নারীর প্রতিবাদের কাছে তারা ভাষাহীন হয়ে গেছে বলেই লেখনীর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন সমাজে সংসারে নারীর যে অবস্থান তা স্পষ্ট ভাবে ভাষায়িত হয়েছে রবীন্দ্রদৃষ্টির অনুভবে। সময়ের মর্জি নিয়ে কিভাবে নতুন হয়ে উঠেছে তাঁর অনুভব তা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের উপসংহার অংশের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে ধরা পড়েছে–

'তারপরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে কিন্তু ভগবান ওকে ত্যাগ করেননি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাকনা কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্ সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়, সেখানে সে অনন্ত। সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল'। (পৃঃ ৬৭৯ রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী প্রকাশনা) মৃণালের মধ্যে যে প্রতিবাদ সুপ্ত অবস্থায় ছিল বিন্দুর মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি অন্বেষণ যেন তার চোখ খুলে দিল। বিন্দুর মৃত্যু হয়েছে অবহেলায়, অনাদরে, অত্যাচারে। যুগ যুগ ধরে মেয়েরা শুধু মরবে একথা মেনে নিতে পারেনি মৃণাল। এই কারণেই ২৭ নাম্বার মাখম বড়াল স্ট্রীট ছেড়ে সে চলে যায়, যাবার মুহূর্তে স্বামীকে লেখা তার পত্রের মধ্যে দিয়ে সমগ্র পুরুষ সমাজকে বলে যায়–

'তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি - ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে

অবিচলিত প্রেমের বাহন হয়ে উঠতে পেরেছিল সবুজপত্রের নারীরা। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির প্রতিটি নারী মুক্তি খুঁজেছিল আপন স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে।

নারীবাদী স্থূল ভাবনা থেকে নয়, নারীকে মানুষ হিসাবে দেখার চেষ্টাতেই তারা নতুন হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার কারাগারে বন্দী মানুষের ব্যাকুল ক্রন্দন লক্ষ্য করা যায় যেমন তেমনি আছে আত্ম অন্বেষণ। প্রায় প্রতিটি নারীই নৈঃসঙ্গপীড়িত, অথচ মরণ নয় তারা বাঁচার লড়াইয়ে উৎসাহী। ' দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার মত এরা মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি অন্বেষণ করেনি। জীবনের গতানুগতিক চাকায় বাঁধা থেকে অর্থহীন, স্বাদহীন, বোধহীন, সংবেদনহীন যান্ত্রিক কালযাপন থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল, 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তী, 'অপরিচিতা'র কল্যাণী, 'বোষ্টমী' গল্পের সর্বংক্ষেপী আনন্দী,'পয়লা নম্বরের অনিলা সকলেই ব্যতিক্রমী চরিত্র। প্রায় প্রতিটি গল্পের পুরুষদের 'আমি' সত্ত্বা নারীর কাছে নমনীয় হতে বাধ্য হয়েছে। হৈমন্তীর স্বামী, অপরিচিতার অনুপম, পয়লা নম্বরের অদ্বৈতচরণ কেউই নিজের অন্তরের সত্যটাকে গোপন করতে পারেনি। নারীর প্রতিবাদের কাছে তারা ভাষাহীন হয়ে গেছে বলেই লেখনীর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন সমাজে সংসারে নারীর যে অবস্থান তা স্পষ্ট ভাবে ভাষায়িত হয়েছে রবীন্দ্রদৃষ্টির অনুভবে। সময়ের মর্জি নিয়ে কিভাবে নতুন হয়ে উঠেছে তাঁর অনুভব তা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের উপসংহার অংশের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে ধরা পড়েছে–

'তারপরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে কিন্তু ভগবান ওকে ত্যাগ করেননি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাকনা কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্ সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়, সেখানে সে অনন্ত। সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল'। (পৃঃ ৬৭৯ রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী প্রকাশনা) মৃণালের মধ্যে যে প্রতিবাদ সুপ্ত অবস্থায় ছিল বিন্দুর মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি অন্বেষণ যেন তার চোখ খুলে দিল। বিন্দুর মৃত্যু হয়েছে অবহেলায়, অনাদরে, অত্যাচারে। যুগ যুগ ধরে মেয়েরা শুধু মরবে একথা মেনে নিতে পারেনি মৃণাল। এই কারণেই ২৭ নাম্বার মাখম বড়াল স্ট্রীট ছেড়ে সে চলে যায়, যাবার মুহূর্তে স্বামীকে লেখা তার পত্রের মধ্যে দিয়ে সমগ্র পুরুষ সমাজকে বলে যায়–

'তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি - ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে

আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল– তার শিকলও তো এত ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্য মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল – ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু - তাতে তার যা হবার হোক। এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।' (পৃঃ ৬৮০) প্রাগুক্ত

চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটিতে মৃণাল নিজের কথাটা বলতে পারল জোরালো কণ্ঠে। সমগ্র পত্রেই মৃণাল তার পরিচয় দিয়েছে মেজবউ হিসাবে। মেজবউ এর মৃত্যুর পর মৃণাল হয়ে উঠেছে 'মৃণাল', একজন নারী, একজন মানুষ। মৃণাল নিজের প্রথম মুক্তি খুঁজে পেয়েছিল লুকিয়ে কবিতা লেখার মধ্যে। পরবর্তী মুক্তি খুঁজে পেল নিজের মত করে বাঁচার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সবুজের অভিযান' কবিতায় যে যৌবনকে আহ্বান করেছিলেন তা তাঁর চিহ্নিত নারী ব্যক্তিত্বের মধ্যে ধরা পড়ল সবুজপত্র পর্বের গল্পগুলিতে। পারিবারিক সামাজিক সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক গণ্ডীর জড়তা কাটিয়ে, কুসংস্কারের বদ্ধ নীড় ছেড়ে চরিত্রগুলি বেরিয়ে এল দুঃসাহসিক অভিযানে। ডানাকাটা বা ডানাছাঁটা পাখীরা দীর্ঘ আকাশে নামল ওড়বার স্বাধীনতা লাভের জন্য। সংযম, সভ্যতা, সীমানা অথবা 'ভালো মেয়ে' হওয়ার প্রথাবদ্ধ গল্প আর তারা শুনল না। পুরুষের চটকদারিত্ব, ভাবালুতা বা আবেগ সবই বুঝতে শিখল তারা। মাটির তালের মত পাওয়া কমবয়েসী নারীকে শিক্ষিত পুরুষেরা কখনো গৃহিনী, কখনো হ্লাদিনী, কখনো চাকরানী বানিয়েছে তাদের প্রয়োজনের খোরাক হিসাবে। 'পয়লা নম্বর' 'অপরিচিতা' 'হৈমন্তী' 'বোষ্টমী' সব গল্পই পুরুষের বানিয়ে তোলা নারীত্বের প্রতিবাদ করেছে। তবে 'পয়লা নম্বরের' অনিলার উদ্দেশ্য পূর্ণতা পায়নি কারণ তার 'শাঁখালোহা' 'তুমি' সম্বোধন অনেকটা দুর্বল করে ফেলেছে তাকে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সিতাংশুমৌলি স্বীকার করেছে –

'তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই।' পুরুষের অমার্জিত উগ্রতা অনেকটা স্তিমিত হয়েছে এখানে। (প্রাগুক্ত পৃ ৭৪০)

'পয়লা নম্বর' গল্পটি অনাবিষ্কৃত নারীসত্ত্বার অসামান্য উন্মোচন হিসেবে গ্রহনীয়। অদ্বৈতচরণ বিচিত্র বিদ্যাচর্চা করে একটি গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে। সীতাংশুমৌলি থাকে পয়লা নম্বর ঘরে। সীতাংশু দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে অশান্তি সঞ্চার করে আনন্দলাভ করে। অন্যদিকে গল্পের নায়িকা অনিলা ও তার স্বামী অদ্বৈতচরণের মধ্যে মানসিক সাযুজ্যের পরিমানটা কম ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ব্যাধি তার মধ্যেও ছিল প্রবল। শ্বশুরমশাই মারা যাবার সময় জামাইকে টাকা না দিয়ে মেয়েকে দিয়েছে। শ্যালক

সরোজের পড়াশোনার ভারও দিয়েছে মেয়েকে। ফলে ডিগ্রিধারী না হওয়া পণ্ডিত জামাইয়ের ব্যক্তিত্বে লাগে। অদ্বৈতচরণ সরোজের পড়ার ভার নেওয়ার ইঙ্গিত দিলে - - 'অনিলা হাঁও বললে না, নাও বললে না' (পৃ ৭৩২) এ যেন অনিলার মৌন প্রতিবাদ। অনিলার ভাই সরোজ পরীক্ষায় কৃতকার্য না হতে পারায় সংসার ভর্ৎসনায় গলায় চাদর দিয়ে আত্মহত্যা করে। অনিলা সে খবর অদ্বৈতচরণকে না জানিয়ে সীতাংশুমৌলির সহায়তায় শেষকাজ সমাধা করে বাড়ি ফিরে আসে। এতটা প্রবল বিষণ্ণতার মধ্যেও অদ্বৈতচরণের কাছে সে নিজেকে উন্মোচিত করতে পারেনি।

সমস্তকিছু স্বাভাবিক রেখে, নিপুনভাবে সব গুছিয়ে একটি টুকরো কাগজে লিখে রেখে গেছে - 'আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খুঁজে পাবে না।' (পৃ ৭৩৮) সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়ে অনিলা ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। অদ্বৈতচরণের উক্তি থেকেই বোঝা যায় তার পরিমান 'কত দিন, কত রাত্রি, কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ বুজে ছিলুম; এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বুদ্‌বুদ্‌ ফেটে গিয়েছে।' (পৃ ৭৩৯)

অদ্বৈতচরণ কোনদিনই অনিলাকে বোঝেনি, বোঝবার চেষ্টাও করেনি। সীতাংশু মৌলির আবেগপ্রবন কথাবার্তাতেও ধরা দেয়নি অনিলা – দুই পুরুষের কাছ থেকেই চলে গেছে অন্য এক নিজস্ব জগতে। যে জগৎটা তার একান্তভাবে আপনার। একটি চিঠির পাতার দুটি অংশে একই লেখা লিখে পুরুষ চরিত্রের স্বরূপকে চিনিয়ে দিয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম ছিল 'বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা' দেখায় অভ্যস্ত মানুষ। নারীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় নিজের পরিচিত চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা ভাবতে ও বলতে দ্বিধা হয় না তার। একদিন যে নারী অনায়াসেই সব থেকে আপনজন হতে পারত কিন্তু পৌরুষের অভাবে যাকে জীবনে বরণ করে নেওয়ার সাহস হয়নি, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই নারীই হয়ে উঠেছে জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত নারী। 'গাড়িতে জায়গা আছে' কণ্ঠস্বর তাড়া করে বেড়ায় অনুপমকে। লেখক যেন এখানে গাড়িকে মানবসভ্যতার চলমান রূপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 'জায়গা' হ'ল সেই অধিকারবোধ যা দখল করে নিতে হয়, যা কেউ ছেড়ে দেয়না। 'আছে' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা চাওয়া পাওয়ার জিজ্ঞাসা প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'শিগ্‌গির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে' এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট প্রমাণিত একটায় না হলে অন্যত্র নিজের যথার্থ স্থান গ্রহণ করতে হবে এবং তা করতে হবে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে। কাঙ্ক্ষিত নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষের কাছে সঙ্গীতের মত মনে হল – 'এমন তো আর শুনি নাই।' পরক্ষণেই দেখা যায় ঐ মেয়েটিই আবার অন্য নারীকে জায়গা দেওয়ার

জন্য বলে 'আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না– এখানে জায়গা আছে।' রেলের কর্মচারী যখন জানায় দুই সাহেবের জন্য সিট রিজার্ভ আছে তখনও মেয়েটি বলে – না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।' কামরায় উপস্থিত পুরুষের প্রতি অগ্নিবর্ষণ করে বললো – না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।' (পৃ ৭১৭) এই উক্তিতেও নিজের ব্যক্তিত্ব ও অধিকারবোধ স্পষ্ট। কল্যাণী শুধু তার জায়গাই পায়নি আরও অনেককে জায়গা করে দিয়েছে। নায়কও গল্পের শেষে স্বীকার করেছে – 'দেখা নাই, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু করে দিই – আর মন বলে, এইতো জায়গা পাইয়াছি।' ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু জানা আমার ভালো, এইতো আমি জায়গা পাইয়াছি।' (পৃঃ ৭১৮) (রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী)

রবীন্দ্রনাথের আর একটি অন্যতম গল্প 'হৈমন্তী'। পুরুষের বানিয়ে তোলা নারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে নায়িকা হৈম। তবে পরিপূর্ণ ভাবে সফল হতে পারেনি। হৈমন্তীর একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল বাবার আদর্শের ভিত্তিতে। তার বাবা সম্পর্কে কন্যের উক্তি –

'আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশঙ্কর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল।' (পৃ-৬৫৯)

আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন, হয়তো বা নাস্তিকও হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। (পৃ ৬৫৪)

এই আদর্শেই হৈমন্তী দেবার্চনা শেখেনি, কিন্তু বাবাকে ঋষিজ্ঞানে ভক্তি ও বিশ্বাস করেছে। হিমালয়ের উদারতা তাকে প্রভাবিত করেছিল অনেকটাই। বাবার বিশ্বাস ও শিক্ষায়, চরিত্র প্রভাবে, বই পড়ার অভ্যস্থতায় হৈমন্তীর বিবাহ পূর্ববর্তী ১৭ বছরের জীবন গড়ে উঠেছিল। যে বয়সে একজন মানুষের পরিপূর্ণ কাঠামোটি তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু সেটা হঠাৎই অন্যরকম হয়ে যায় শ্বশুরবাড়িতে অনুদার পরিবেশের মধ্যে। সবকিছুর মধ্যেই বাবার আদর্শ অন্বেষণ করতে গিয়েই তার জীবনের বিড়ম্বনা বেড়েছে। তার তীক্ষ্ণ অনুভবশীল মন বাঙালীর ঘরোয়া সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে নির্বোধ আপস করতে পারেনি। না ছিল না বলে সামাজিকতার নানা রূপই তার কাছে অধরা ছিল। বাবার আদর্শে লালিত হৈমন্তী বানানো মিথ্যা বা কৃত্রিমতা শেখেনি কখনো। দিদিমাদের কাছে বয়স লুকানোর দরকষাকষিতে সকলের সামনেই নিজের সত্য বয়স স্বীকার করেছে। পাশাপাশি বাবার নামে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করে বলে– 'বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।'

হৈমন্তীকে প্রথমে আদর যত্নের কারণ ছিল পিতার অর্থের প্রতি লোভ। কিন্তু সে সত্য যখন উদ্‌ঘাটিত হয় যে তার পিতা ঋণ করে তার বিবাহ দিয়েছেন সেদিন থেকে তার উপর নানাভাবে অত্যাচার চলতে থাকে, স্বামীও তার যথাযথ প্রতিবাদ করতে পারেনি। হৈমন্তীর দুর্বল স্থান তার বাবা একথা সকলে বুঝতে পেরে বাবাকে কেন্দ্র করে অপমানই বেশি করতে থাকে। পূজার ডালা সাজাবার ডাক পড়লে হৈম জিজ্ঞাসা করে কেমন করে সাজাব। এই কারণে বাবাকে নানা কথা বলতে থাকে সকলে। এর প্রতিবাদ হিসাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল – 'আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে।' এরপর থেকে 'ঋষিবাবা' বলে ব্যঙ্গ করতো সকলে। কথক নিজে স্বীকার করেছেন হৈমর উদার মানসিকতার স্বরূপকে 'একতো হৈমর ভালবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত'। (পৃ ৬৫৫)

হৈমর এই উদারতা তৎকালীন ভারতবর্ষের নারীদের থেকে বেশি ছিল বলেই এত অশান্তি। পিতা কন্যার সম্পর্কের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে প্রথমবার কন্যার শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবার সময় এবং শেষবার আসবার সময়। বাবার অপমান সহ্য করতে না পেরে বাবাকে বলে – 'বাবা আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব'। (পৃ ৬৫৭)

এর উত্তরে পিতা বলে–

'ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।' (পৃ ৬৫৭)

এই উক্তি প্রমাণ করে ভালবাসার নিবিড়তা। কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন স্বামীর কাছে তা যোগ্যমূল্য পায় না বলেই শুনতে হয় হৈমকে –'শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে।' (পৃ ৬৫৭)

এরূপ পৌরষত্বহীন, ব্যক্তিত্বহীন জীবনসঙ্গীর পাশে হৈমর প্রতিবাদ ম্লান হয়ে যায়।

১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে সবুজপত্র পত্রিকায় 'বোষ্টমী' প্রকাশিত হয়। এরপর একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে জানান রবীন্দ্রনাথ 'আমার এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্ ঢক্ করে খাবার মত হচ্ছে না – এগুলো গল্প না বল্লেই হয়।' (চিঠিপত্র - পঞ্চম খণ্ড পৃ ১৮০)

'বোষ্টমী' গল্পটিতে এ কথার তাৎপর্য যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে। গল্পের প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাথের আত্মকথন। বিভিন্ন সময়ে বোষ্টমীর মধ্যে নারীত্বের নব নব রূপ অনুসন্ধান

করেছেন লেখক। আদি-মধ্য-অন্ত পরম্পরাযুক্ত নিটোল কাহিনী খুঁজতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হবেন সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পাঠক। যেন মনে হয় এক নারী তার সহস্র লীলার মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে নিজের একান্ত চরিত্রটি গঠন করেছে। কতগুলি সংলাপ দিয়ে যে গল্প লেখা যায় এমন বাংলা সাহিত্যে আগে দেখা যায়নি। গল্পটি উত্তমপুরুষে লেখা। গল্পের প্রথমে 'আমি' হল বোষ্টমী আর গল্পের শেষের 'আমি' একটি নারী যে তার নিজস্ব ব্যক্তি সত্তা নিয়ে জাগ্রত। নিজের মধ্যে দিয়ে আত্মসমীক্ষা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে বোষ্টমীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

আনন্দী আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নয়, আলাদা। নারীর স্বাভাবিক কন্যাত্ব, মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়নি; 'আরও এক বিপন্ন বিস্ময়ের' অনুসন্ধানে জীবনপথ পরিক্রমা করেছিল। আনন্দী বলে –

'পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। যে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না।' (পৃ ৬৬৮) প্রাগুক্ত।

যথার্থ ভালবাসা না থাকলে সে তার বদলা নেবেই। আনন্দীর স্বীকারোক্তিতে একান্ত এই আত্মবিশ্লেষণ ধরা পড়েছে। ছেলের মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে নতুন পথ হাঁটা শুরু করে আনন্দী, গুরুসেবায় আত্মহারা হয়ে ভক্তি ও পার্থিব তৃষ্ণা মিশে গেল একই স্রোতে। বোষ্টমী হয়ে গৃহত্যাগ করেও শান্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রৌঢ়া বোষ্টমী তার ভক্তির মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য বোধকে খুঁজে পেয়েছিল।

এই গল্পে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। বৈষ্ণবীকে বোষ্টমী রূপে দেখার মধ্যে যে আঞ্চলিকতা আছে, প্রাকৃতের সুর আছে, মাটির গন্ধ আছে তা কারণকর্ত্রী নারীর সজীব মূর্তি। বোষ্টমীর জীবনে পুরুষ ক্ষণকালের জন্য উদিত হয়ে উর্বরা করেছে কিন্তু সেই কর্ষনে পীড়ন নেই, নেই উগ্রতা বা বুভুক্ষতা। সর্বখেপির বলবলের মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীনতা ছিল সেখানেই ছিল নারী ব্যক্তিত্বের বীজ। বৈষ্ণবী যে অন্ন জোগাড় করত তা নিজের অথচ নিজের নয়, পরের অথচ পরের নয়। এই দুয়ের যে সন্ধিক্ষণকে সে আপন অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছিল সেটাই তার স্বতঃস্ফূর্ত নিজস্বতা।

বোষ্টমীর মধ্যেও আগুন ছিল। তার উক্তি থেকে জানা যায়

'বেণী ভাবিয়াছিল,আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু এতো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন।' (পৃ ৬৬৩) এই আগুনই গুরুঠাকুরের রূপে মোহিত করে, একতারা করে গান গাইতে সাহায্য করে আবার গুরুর মুখে নিজের দেহের প্রশংসা শুনে

তার প্রতিক্রিয়া – 'ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ঝোপে-ঝাপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে।' (পৃ৬৬৬)

এই আগুনের মধ্যে দিয়েই নিজের বিবেকের আত্মদাহের মধ্যে সমস্ত খাদকে পুড়িয়ে এক স্বতন্ত্র খাঁটি সোনাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। এই কারণে তার ভক্তির সহজিয়া সত্যবোধের শিকড়টি অটুট ছিল।

সবুজপত্র পর্বের গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায়-- হৈমন্তীকে তার স্বামী জোর করে অত্যাচারের বাইরে আনতে পারেনি, ভালবাসাও দিতে পারেনি। বোষ্টমী স্বামীর ভালবাসা পেয়েও তার নিজস্ব জীবনসত্য অন্বেষণ করতে বেরিয়েছিল। স্ত্রীর পত্রের মৃণাল সত্যের জন্যই মাখন বড়াল স্ট্রীট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। তার প্রতিবাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর অপরিচিতার কল্যাণী শুধু নিজের জায়গা তৈরী করেনি অন্যদেরও উজ্জীবিত করেছিল। নারীর সাধনার পাশাপাশি পুরুষের সাধনাকেও অনন্তের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছিল, সাধারণত পাঠক যে সমস্ত নারী চরিত্র দেখতে অভ্যস্ত এরা সেই ধরণের নয়, অনেকটা আলাদা। এরা এত উজ্জ্বল এবং ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ এদের ঢকঢক্ করে গিলে ফেলা সম্ভব নয়। আমাদের মানসলোকের ফেনিয়ে তোলা কল্পনা বা আয়াস করে হজম করার যে প্রবণতা তা এখানে নেই। সদাসতর্ক থাকতে হয় অন্যপক্ষকে কারণ বিপথগামী হলে আর ফিরে আসার পথ নেই। নারীকে ভোগের, ব্যবহারের বস্তু বা কল্পনার পুত্তলিকা হিসাবে না দেখে একজন মানুষ হিসাবে দেখবার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন লেখক এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে। এই গল্পগুলি মুহূর্তের কোন ছোটগল্প নয় — বলা যায় এগুলি কবির জীবনজিজ্ঞাসার সামগ্রিক রূপায়ণ।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১। রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী প্রকাশনা

২। কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গল্প - জ্যোতির্ময় ঘোষ

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ - তপোব্রত ঘোষ

৪। রবীন্দ্র গল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ - ক্ষেত্রগুপ্ত

৫। রবীন্দ্র রচনাবলী - বিশ্ব ভারতী প্রকাশনা।

আমন্ত্রিত রচনা

আর এক মুক্তির রক্তকরবী

সুপ্রিয় ভট্টাচার্য
অর্থনীতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

পোল্যান্ডের জনবিদ্রোহে শ্যমানের রচিত নৃত্যসঙ্গীত শুনে শোঁপার মনে হয়েছিল যে , সে অবিস্মরণীয় সঙ্গীত সঙ্গীত নয়, ফুলের কোমলতা দিয়ে ঘেরা এক সাগ্নিক প্রেরণার মন্ত্র যেন রচিত হয়েছিল শ্যমানের হাতে — যাকে শোঁপা বলেছিলেন 'Cannons buried in flowers' 'কুসুমে লুকোনো কামান।'[১] আর আজ যখন পঁচিশে বৈশাখের স্মৃতিতে উদ্বেল হয়ে দিকে দিকে ফুটেছে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, ছড়িয়ে গিয়েছে আরও একবার 'নব্র আগুন' আমাদের সব ক্লান্তি আর শূন্যতার পাশাপাশি, তখন সেই রক্তিমা যেন মনে পড়িয়ে দেয় নন্দিনীর মাথার রক্তকরবীকে উদ্দেশ্য করে অধ্যাপকের সেই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত ঃ "এই রক্ত আভায় একটা ভয় লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।"

'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশের পর চুরাশি বছর পেরিয়ে গেল রক্তকরবীর। অথচ তার যৌবন ক্ষয়িত নয় আজও— তার অন্তরালবর্তী স্রষ্টার যৌবনময় পৌরুষের মতই এ নাটকের কুশীলবদের অনেক কথায় আজো নক্ষত্রের আলো। যে 'বুড়ো ব্যাঙ টা সকল সুরের ছোঁয়াচ' বাঁচিয়ে আমাদের মধ্যে আজও টিকে আছে , তার পাশে বারবার ঐ রঞ্জন, নন্দিনী, বিশুরা এসে ভিড় করে। মাধুর্যের সঙ্গে তারা বয়ে আনে ভয়লাগানো রহস্য। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে যে মানুষকে দেখে নেরুদা বলেছিলেন ঃ "I knew him and he goes on haunting me" - 'সে আমাকে তাড়া করে ফেরে, আমি তাকে চিনতাম।'[২] —সে মানুষেরই আদল স্ফুরিত হয়ে ওঠে ঐ রঞ্জন, বিশু আর নন্দিনীর মধ্যে।

রক্তকরবীর মকররাজেরা আজ চারপাশ বৃহত্তর ও ব্যাপ্ত ভূমিকায় ছেয়ে গেছে — আজ তো আরও বেশী করে সত্যি যে, অজস্র ছোটদের আজ বলি দিতে হয়, আর তাতে "ছোটগুলো হতে থাকে ছাই , আর বড়োটার জ্বলতে থাকে শিখা।" বহুদিন আগে অধ্যাপকের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলিয়ে ছিলেন তা কি আজ ভীষণ ভাবে সত্যি নয়? "থাকবার জন্য মরতে হবে একথা বলে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু থাকবার জন্য মারতে হবে, একথা যারা বলে তারাই থাকে। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।" আর তাই বড়ো সত্যি আজ অধ্যাপকের ঐ

কথাও ''উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই। বানিয়ে তোলা কাপড়েই কেউ রাজা, কেউ
ভিখারী।" জীবনের বেশীর ভাগটাই আজ শুধু নিরাপত্তার ত্রস্ত অন্বেষণ, অর্থের তাড়
জীবনবিবিক্ত বিজ্ঞ মানুষের কূটতর্ক আর জ্ঞানের নামে পাণ্ডিত্যের গর্বিত বিলাস —
অধ্যাপকের নির্মম স্বীকারোক্তি আমাদেরও : '' মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে
পণ্ডিতটুকু জেগে আছে।" আজ যান্ত্রিকতায় জীবনটাকে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো ক
আমরা নিজের নিজের ছায়াচ্ছন্ন বৃত্তে, অথবা আর্নল্ডের সেই 'নিঃসঙ্গ দ্বীপে' ভাস
যে সমগ্রের চকিত উদ্ভাস ধরা দেয় শুধু নন্দিনীর মত আমাদের আশেপাশে দুই এক
মানুষের কবিতাভরা গভীর চোখে, তার জন্য তৃষ্ণা তো আমাদের স্বাভাবিক। কা
যক্ষপুরীর মতো আমাদের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি : '' সব জিনিসকে টুক্‌রো করে আন
এদের পদ্ধতি।" আর তাই আমাদের জমিয়ে তোলা ভার এমনই যে রাজার মত, ''স
কাজটাই আমার কাছে শক্ত।"

এমনি আরো আছে, রক্তকরবী-র প্রাসঙ্গিকতা তাই আজ কিছু কিছু প্রশ্নে আমা
চেতনাকে তীব্রভাবে ছুঁয়ে যায়, এ হল তাই যাকে সামনে রেখে কিয়দংশে বলতে প
আমরাও, যা বিশু বলেছিল নন্দিনীকে দেখে, ''তুমি এমন করে আমার দিকে চাইলে
মনে হল এখনও আমার মধ্যে আলো দেখা যাচ্ছে।" শুধু নতুন করে তাকে সৃষ্টি ক
নিতে হবে আজ যেমন রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন তাঁর নাটকে দেশজ উপকরণ কা
লাগিয়েই তাকে নতুন প্রয়োজনে রূপান্তর দিতে।

যুগ বদলে গেছে, সমস্যা অনেক জটিল আকার নিয়েছে ঠিকই, ঔপনিষদিক
শান্ত, সমাহিত দৃষ্টি ও প্রত্যয়ী পৌরুষ রবীন্দ্রনাথের চেতনা অনেকটা জুড়ে ছিল,
আমাদের নেই। অনেক কারণই হয়ত এর জন্যে দায়ী। তবু রক্তকরবীর সব কথাই
তত্ত্বকথা বা কাব্যপ্রতিমা মাত্র? নাটকের প্লট, নাটকীয়তা নিয়ে কিছু সমালোচনা চল
পারে হয়তো। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কথায় কিছু কিছু সময় একটু তত্ত্বের ছোঁয়া
যেন এসে যায়। কিন্তু আজকের জটিল যুগমানসে কিছুই কি পাই না আমরা নন্দি
বিশু, রঞ্জন এমনকি রাজার কাছে থেকেও সেই ইয়েটসের আদর্শে : "no bundle
formulas, not faggots, but a fire ?" —'তত্ত্বের গুচ্ছ বা জ্বালানীর আঁটি ন
অগ্নি।"[৩]

মনে হয় পাই। আমাদের প্রতিদিনের বিক্ষুব্ধ 'আমি'র মিছিলে নন্দিনীদের দে
মেলে না, কিন্তু আমাদের রক্তের গভীরে আজও পৌষের গান। হৃদয়ের যে 'শব্দহী
জ্যোৎস্না'র কথা বলেছিলেন জীবনানন্দ, তাতে আরো বেশী করে আজ 'পথচাওয়
গান' ভেসে বেড়ায়। বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা, আর ক্লান্তির প্রহর থেকে ছলকিয়ে ওঠে

সেই অশ্রু যা রাজার আর্ত চোখ থেকে ঝরতে চেয়েও ঝরতে পারে না কোনদিন।

অথচ সেই অশ্রুই একদিন এনে দেয় আমাদের সামনে নন্দিনী আর রঞ্জনকে। যে প্রেমায় সেই অমিতযৌবন রবীন্দ্রনাথের বোধের গভীর থেকে উঠে আসে নন্দিনী আর রঞ্জন-এর পাশাপাশি পাগল ভাই বিশু, তাদের কখনো হারানো যায় না, হারানো মানেই তো সেই কোয়াসিমোদো যেমন বলেছিলেন : " to lose is to go beyond a diagram of the sky / along movements of dreams / and a river full of leaves", হারানো মানেই তো "সেই আকাশের নকসাটুকু পার হয়ে যাওয়া স্বপ্ন-প্রগতির আর পাতায় পাতায় ছাওয়া একটি নদীর পাশে পাশে"[৪] নতুন করেই তাদের আসতে হয় যুগের প্রয়োজনে, তাই না নন্দিনী বলেছিল রঞ্জন সম্বন্ধে "ও কখনো মরতে পারে না, ও আবার আসবে" — কথাটা অনেকদিক দিয়েই তো সত্যি। এমন একটা সত্য, এমন একটা দ্যুতি তাদের মুখের কথার মধ্যে পেয়ে যাই আমরা যে নেরুদার মত মনে হয় আমাদেরও "The first word uttered / perhaps it was only a ripple, a single drop, / and yet its great cataract falls and falls / later on, the word fills with meaning" "প্রথম শব্দের / উচ্চারণ হলে পর / হয়ত তা ছোটো ঢেউ, বিন্দু এক / ধীরে ধীরে ভরে যায় অর্থময়তায়।"[৫] তার কারণও নেরুদা বলেছেন যার থেকে নন্দিনী আর বিশুদের কথার পুরোনো ভঙ্গিমার আগল ভেঙে তার ভেতরকার বিশ্বকে আমরা চিনে নিতে পারি : " because the word is the source / and vivid life ---it is blood / blood which — expresses its substance and so ordains its own unwinding ./ Word give glass quality to glass, blood to blood , and life to life itself "[৬] "যেহেতু ক্রিয়াই উৎস / । প্রাণবন্ত প্রাণ—যেহেতু শোনিত এ-ই / শোনিত যা নিজের সত্তাকে ব্যক্ত করে এবং সেভাবে গাঢ় সত্তাবিত করে তোলে উন্মোচন। / শব্দই কাচকে কাচ করে তোলে, রক্তকে শোনিত / খোদ প্রাণকেই প্রাণ।"[৬]

তাই নতুন করে রাজার কাছে জানতে চায় মন,কী সেই ছন্দের বিভা—যা তিনি নন্দিনীর মধ্যে দেখেছিলেন যাতে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়? যে ছন্দ বিশ্বের চলনের ছন্দ? আবিষ্কার করতে চায় আজকের মন : কী সেই বাঁধন যাতে নিজেরাই নিজেদের বেঁধে আমরা ছটফট করে মরছি, যা নন্দিনী চিনিয়ে দিয়েছিল রাজাকে?

কিন্তু এতই কি অপরিচিত এই ছন্দ? তাই যদি হবে তবে কেন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসেরও একদিন বুকের রক্তে ওঞ্জরণ শুরু হয়ে যায় জীবনের শেষ পর্বে গান শেখার জন্য? সেই ছন্দিত বেদনাই তো ইয়েট্‌সের সারাটা জীবনে এক নিদারুণ আর্তিতে

ছেয়েছিল—শেষ জীবনে তাঁর সেই আকুলতা " Grant me an old ma
frenzy..... A mind that Michael-Angelo knew / That can pie
the clouds"[৭]। আর এই কারণেই 'waste land' থেকে এলিয়টকে একদিন
পৌঁছতে হয় 'Wisdom of humility' তে[৮] —যা তাঁকে ক্রমে উত্তীর্ণ করে 'Int
section of time with the timeless'[৯]-এর বোধে। অথচ আমাদেরও অভি
বৃত্তে এসে যায় এই বোধ, যখন সমুদ্রে সূর্যোদয়ের উচ্ছ্বাসে স্তব্ধ হয়ে যায় মন,
কোনো গানের গভীর সুরে মিথ্যা হয়ে যায় জীবনের সব লেনদেন। অতিম
রাজনীতিসচেতন নেরুদার প্রার্থনাও তাই আসে জীবনের সেই মূল হতে, যেখানে
পান তিনি সেই "সৌন্দর্যের, যার ফুল ফোটে অন্ধকারে"; এখানেই শেষ
'আসবাবের কবি'[১০] বলে যাঁকে কোনো খণ্ড মুহূর্তে বর্জন করেন রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পো
কাছে—আধুনিকতার অন্যতম পৃথিকৃৎ সেই অবিস্মরণীয় বোদলেয়ারও জ্বলে ওঠে
কতবার ঐ ছন্দকে অধিগত করার বিশ্বব্যাপী আর্তিতে—আলেন পো-র রচনায় প্র
হয়ে তিনি বলে ওঠেন "সুন্দরের প্রতি আমাদের সেই মৃত্যুহীন অনুরক্তির" কথা
"এই পৃথিবী আর তার দৃশ্যাবলীকে আমাদের মনে হয় স্বর্গের এক চকিত প্রেক্ষ
প্রতিরূপ" [১১] কতবার যথার্থ আধুনিকের মত জগতের ও জীবনের সমস্ত কুৎসিত
তীব্রভাবে অনুভব করে তিনি তাঁর প্রাণের আগুনকে তুলে নেন এই বিশ্বাসে ঃ "
কী প্রমাণ আছে? ভগবান, এই তো পরম, / এই তো নির্ভুল সাক্ষ্য আমাদের
মহিমার, / এই যে আকুল অশ্রু যুগে যুগে করে পরিশ্রম / অবশেষে লীন হ'তে অসী
সৈকতে তোমার।" [১২]

অথবা তাই বা কেন? আশেপাশেই কিশোরীর নৃত্যপরা পায়ে, উচ্ছল হাসি
আর চোখের নম্র আলোয় আমাদের গাম্ভীর্য পরাস্ত হয়ে যায় বারবার। ঐ ছ
প্রবর্তনাতেই তো এখনও আমাদের কাছে আসার চেষ্টা চলে দিনরাত—দিনরাত রক্ত
পায়ের ক্লান্তি এসে থেমে যায় ঐ গ্রহনক্ষত্রের আলোয়, সে আলোয় কতমুহূর্তে
আত্মসমর্পণের এক গভীর ভাষা ঝরে পড়ে।

আসলে ঐ ছন্দেরই অপর নাম বোধহয় আনন্দ অথবা ভালবাসা—তা
উদ্দেশ্যসিদ্ধি বা স্থূল প্রয়োজনের ভার থাকে না বলেই তা এমন মুক্তপক্ষ, তা ব
ভার হালকা করে দেয়। এতো আমাদেরও অভিজ্ঞতা যাকে ঠিক লক্ষ্যে নেন নেরু
এই উচ্চারণে ঃ " I know I go on and go on because I sing an
because I sing," "আমি জানি আমি এগিয়ে চলেছি সেও এগোনোরই জন্য
গান গাই সেও গান এই জন্য।" [১৩]

আর এখানেই চলে আসে রক্তকরবী-কে একটা বিশেষ পরিমন্ডলে সীমায়িত করে দেখার প্রশ্ন। কেননা রক্তকরবী-কে আমরা অনেকেই শুধু ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করি। সঙ্গত এই দৃষ্টি, কিন্তু শুধু এই কারণেই রক্তকরবী প্রাসঙ্গিক নয় আজ। নন্দিনীর মধ্যে এই ছন্দের কথা বলে রবীন্দ্রনাথ যখন তাকে একটা বিশ্বজনীন মাত্রা দেন, তখন তা অনায়াসে ছাপিয়ে যায় ঐ বিশ্লেষণকে; কারণ রাজা তো এ-ও বলেন, 'বিশ্বের বাঁশিতে সুর বাজে ঐ ছন্দে, ঐ ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মত আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে" শুধু এই নয়, নন্দিনীও রাজার কষ্টের মূল খোঁজে এইভাবে ঃ "তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।" সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বস্তুতান্ত্রিক শোষণ থাকবে না ঠিকই, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে আত্মিক যোগ, বিশ্ব ও প্রকৃতির সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা এবং তা থেকে উঠে আসা বিশ্বজনীন আনন্দের বোধ যে সঙ্গে সঙ্গেই এসে যাবে, এমনটি বলা চলে না। কারণ, শোষণের কারণটাও শুধু উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, মানবিক আবেগের ক্ষেত্রে তা আসে নানা রূপ নিয়ে। মানুষের ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কটাই যে একমাত্র সম্পর্ক নয়, সে বোধে সার্ত্র ও একদিন উত্তীর্ণ হন তাঁর 'Critique of Dialectical Reason'- এর কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে। মার্ক্সকে অঙ্গীকার করেই তাঁকে বিপুলভাবে ছাপিয়ে যান সার্ত্র তাঁর শেষ সংলাপে, কারণ তিনি বলেন ঃ "মানুষের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কটাই একমাত্র সম্পর্ক নয়, সে সর্বোপরি মানুষ।" [১৪] কোনো মিথের আশ্রয় না নিয়েই মানুষের মধ্যে এক আদিম ভ্রাতৃত্বের সন্ধান পান সার্ত্র, সমস্ত মানুষের মধ্যেই তিনি দেখতে পান এক চরম লক্ষ্যরূপী মানুষের সম্ভাবনাকে যে সম্ভাবনায় আমরা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত, যার আবেগময় প্রকাশ ঐ ভ্রাতৃত্ব। কেন না তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের উৎপত্তির মূল যে অভিন্ন,সেকারণেই ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা লুপ্তির পরেও জমে উঠতে পারে ক্লান্তির, আবেগের সূক্ষ্ম সংঘাত। আমাদের মনের জমিয়ে তোলা ভার তাই শুধু শোষণ বা ধনসম্পদ জমিয়ে তোলার ওপরেই নির্ভরশীল নয়। তার কারণ বহুধাব্যাপ্ত, অতি গভীর। না হলে মেনে নিতে হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একদিন লুপ্ত হয়ে গেলে রক্তকরবী কোনো বার্তাই আর নিয়ে আসবে না আমাদের কাছে।

একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে রক্তকরবীতে আছে ধনতন্ত্রের উৎকট রূপ, তার সর্বনাশী যান্ত্রিকতা,স্থূল আত্মসর্বস্বতা, আত্মিক শূন্যতাবোধ, শোষণ, সম্পদের জন্য তীব্র লালসা, পারস্পরিক সন্দেহ আর বিক্ষুব্ধ মনোভাব, খণ্ডিত জীবনবোধ আর একমুখী অস্তিত্ব এবং সর্বোপরি জীবনের মূলীভূত আনন্দ আর সৌন্দর্যের বোধ থেকে স্খলিত নির্জীব

মানুষের ভিড়। কিন্তু এ সবকে ছাপিয়ে আছে 'ধূলোর আঁচলভরা' পৌষের অনিঃশেষ গান, ঐক্য আর সংহতিতে অন্বিত এক গভীর জীবনবোধ যা আমাদের চিরকালের আশ্রয়। আছে সেই ভালবাসার উচ্ছলন যা রাজার বুকেও একদিন জ্বেলে দেয় তৃষ্ণার বিস্ফোরণ; যা নন্দিনীকে বার বার নিয়ে যায় রাজার কাছে। সেই ভালবাসা থেকে উঠে আসে এক ভাস্বর আর আত্মিক বীর্য—সে প্রজ্ঞা সব বিকৃত প্রাণনাকেই চূর্ণ করে দেয়। কিন্তু শক্তিমানের অন্তরতম সম্ভাবনায় থেকে যায় মৃত্যুহীন বিশ্বাস, শক্তির সঙ্গে কল্যাণকে যুক্ত করার বিরামহীন প্রয়াসে সে বিশ্বাস নন্দিনীদের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মস্কোয় বাংলার বিখ্যাত অধ্যাপক রবীন্দ্রপ্রেমিক দানিয়েলচুক মনে করিয়ে দেন আমাদের গিরোস্কির (যিনি প্রথম রুশভাষায় 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করেছিলেন) সেই কথা : 'রবীন্দ্রনাথ মহাবিশ্বদর্শনের আনন্দের কবি।" [১৪] আর এখানেই আধুনিক কালের সেই প্রবাদপ্রতিম লোরকার সঙ্গেও মিলে যান রবীন্দ্রনাথ, যখন লোরকা নিজেকে বলেন "a brother of all men". যখন লোরকা সমসাময়িক সমস্যার অগণিত 'মুখোশ' থেকে ছেঁকে নেন 'মুখশ্রী'কে তাঁর সেই অপ্রতিহত তেজে, সেই "Omnipotence to dissolve past and future in one everlasting moment" " অতীত এবং ভবিষ্যৎ এক শাশ্বত মুহূর্তে মিলিয়ে দেবার অসীম শক্তি"-তে।

রক্তকরবীতে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক সত্যের মুখোশপরা ভণ্ডামিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্যকে তার জীবনবিবিক্ত ধোঁয়াটে অনুষঙ্গ থেকে মুক্তি দিয়ে দেন এক বিশাল ব্যাপ্তি—এক্ষেত্রেও মুখোশ আর মুখশ্রীর তফাতটা তিনি খেয়াল রাখেন। কেন না বিশু বলে ঃ "যে রশিতে এই চাবুক তৈরী সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরী। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সেকথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।" মনে পড়বেই ব্রেখটের কথা—সেই ব্রেখট্ যিনি গ্যেটে ও শেক্সপীয়রের রচনা অবলম্বন করে 'শান্তি', 'সৌন্দর্য', 'সত্য', 'ভালোবাসা' ইত্যাদি নানা প্রশ্নে লিখবেন তীক্ষ্ণ কোন প্যারডি, কিন্তু সে শুধু এই জন্যেই যে এই মহৎ মানবিক আবেগগুলোকে নিয়ে আধুনিক মানুষের সুচতুর ভণ্ডামি তাঁর কাছে অসহ্য। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও তাই "claims only that beauty is among other things, misused to hide the really existing ugliness, but he leaves beauty itself actually invoilable" "দাবি করেন যে, অন্যান্য বহু কিছুর সঙ্গে সুন্দরেরও অপব্যবহার ঘটে বিদ্যমান কুশ্রীকে ঢাকার প্রয়োজনে। কিন্তু যা তন্মাত্র সুন্দর তাকে প্রকৃতপক্ষে অশুচিকরণের অতীত মনে করেন। "[১৮]

'বিশ্বপ্রকৃতি আর মানুষকে বড় কবিরা যে সত্য সম্বন্ধে দেখেন সেই সমগ্রতার প্রভা

আমি ভাষায় বলতেই পারবো না। সেই প্রভা সেই দ্যুতিটাই সাহিত্যকে মতের দলাদলি থেকে অনেক উর্ধে নিয়ে যায়,—ছন্দোলোকে।" বলেছিলেন শ্রদ্ধেয় অমিয় চক্রবর্তী [১৯]। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তুলেছিলেন শেক্‌সপীয়ার-এর কথা। সত্যিই শেক্‌সপীয়ার যে কাকে সমর্থন করেন বলা শক্ত। সমদৃষ্টি নিয়ে সকলকে দেখা, তাদের সমস্যাকে বুঝবার চেষ্টা করা, পুরোমাত্রায় সমঝদারের মতো - এটিই অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন স্রষ্টার ইন্টিগ্রিটি রচনা করে। এদিক থেকেও রক্তকরবী থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে আজকের দিনে। মানুষকে শুধু খারাপ বা ভাল বলে দেগে দেবার যে উপরভাসা চেষ্টা আমাদের, সেখানে শেকস্‌পীয়ার-এর মত রবীন্দ্রনাথও মানুষের সত্যকার সম্বন্ধে তার ভেতরের সত্য আর সমস্যা টাই ধরবার চেষ্টা করেন— যে কথা ১৯৩৪ সালে গোর্কি মনে করিয়ে দেন নাট্যকার আইজ্যাক বেবেলকে, "the task of great art is to reveal people in all their complexity"[২০] "মহৎ শিল্পের কাজই মানুষকে তার সমস্ত সমগ্র জটিলতা সহ উন্মোচিত করা।" রাজার দুর্দমনীয় শক্তির পরিচয় দিয়েও রবীন্দ্রনাথ দেখান তার নিজের চোখে নিজের চেহারা, শক্তির ক্রীড়নক হয়ে তার অসহায় আর্তি আর নন্দিনীর প্রাণের আনন্দকে নিজের করে নিতে না পারার এক অসহনীয় তৃষ্ণা। আপোষহীন নন্দিনীর চোখেও ঘনিয়ে ওঠে অশ্রুর ছায়া যখন বিশুকে সে বলে ওঠে রাজার এই অন্তর্গত ট্র্যাজেডিকে লক্ষ্য করে : "ওর ওপর দয়া হয় না তোমার ?" বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেও নন্দিনী খুশি হয় রাজার শক্তির প্রকাশ দেখে ,উপলব্ধি করে সে শক্তিরও প্রয়োজনীয়তা, তাই তাকে অঙ্গীকার করেই সে রাজাকে ডাক দেয় পৌষের মাঠে, নীল আকাশের নিচে। আবার, প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে রঞ্জন হারজিতের খেলায় নন্দিনীকে জিতে নেয়, যেখানেই যায় সঙ্গে করে সে ছুটি নিয়ে আসে। -তবে বিশুর কাছে থেকেই নন্দিনীকে পেতে হয় 'দুখজাগানিয়া গান', বিচ্ছেদের দিনে পাথেয় খুঁজতে হয় বিশুরই 'পথ চাওয়ার গানে'। রাজার হাতে রঞ্জনের মৃত্যুতে যখন আমাদের সমস্ত সত্তা সহস্র শিখায় জ্বলে ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথ রাজার সমস্যাটিকেও দেখিয়ে দেন : "এমন করে বলেছিল (নন্দিনীর নাম), সে আমি সইতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়িতে নাড়িতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।"

এই চেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কাজ করে, কেননা মানুষের চেতনার অনেকটাই দেখতে পান এই কবি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির পথ ব্যেপে থেকে যায় সেই দুটি গভীর সূত্র, মানুষকে ভালবাসার শক্তি যা থেকে তিনি আহরণ করে নেন। তাঁর "Religion of Man"- এ সেই সূত্রেরই মর্মভেদী ঘোষণা -"In all our faculties or passions there is nothing absolutely good or bad ... They are notes that

are wrong when in wrong places."[21] এবং "All tragedies result from truth remaining a fragment"[22], এই জ্ঞান থেকেই তিনি তাই বলতে পারেন -"Man is not imperfect, but he is incomplete."[23]

আবার কাজ করা যখন আমাদের হাতে এক যান্ত্রিক স্থবিরতা লাভ করতে চায় আজকের ব্যস্ততায় ক্লিষ্ট জীবনে, তখন রঞ্জনের স্পর্ধিত ভাঙা সারেঙ্গিটা কাঁধে ফেলে আমরাও কি চেষ্টা করতে পারিনা এই কথা বলতে : "কাজের রশি খুলে দিয়েছি তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে ।" তাহলে যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন যে, বাক্যের শিল্প গান আর পায়ে চলার শিল্প নৃত্য, বলেছিলেন মানুষের প্রাত্যহিক এবং জৈবিক প্রয়োজনকে ছাপিয়ে থেকে যায় এক উদ্বৃত্তের জগৎ—শিল্প সে উদ্বৃত্তেরই উচ্ছলন, এখানে দেখছি তিনি এগিয়ে গেলেন আরো, জানতে চেষ্টা করলেন সুরের সাধনা সম্ভব কাজেও অথবা প্রাত্যহিক কাজেরও প্রবর্তনা হতে পারে আনন্দ, সেই সুষম ছন্দ যাকে জিব্রান বলেছিলেন : "love made visible"[24] কবীর, দাদু আর শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ যেমন মনে করিয়ে দেন আমাদের," এখনো তো আমাদের অভিজ্ঞতার সামনে আছে বৈঠা বাওয়ার গান, ছাদ পেটানোর গান"[25]। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় এতটা সম্ভব কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে—তবে একটা ইঙ্গিত থেকে যায়। সে ইঙ্গিত আমাদের ভেতর আর বাইরেকে এক করার এষণার দিকে ,আমাদের প্রাত্যহিক কাজের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যকে অঙ্গিকার করেই যে সামগ্রিক উদ্দেশ্যের বীজ সুপ্ত থাকে আমাদের চেতনায়—যেখানে এসে মিলে যায় সুরসাধনার গহনতম সঞ্চার, চেতনার এই অখণ্ডতাই কি আনতে চায় না রঞ্জন?

নন্দিনীকে রাজা যখন মেরে ফেলতে চান, অকুতোভয় নন্দিনী বলে ওঠে : "তারপর থেকে আমার এ মৃত্যু মুহূর্তে মুহূর্তে তোমাকে মারবে, আমার অস্ত্র নেই , আমার অস্ত্র মৃত্যু।" শুনে মনে হতে পারে পাগলের প্রলাপ, অথচ কি গভীরভাবে সত্যি আজকের দিনেও। আসলে মৃত্যুই বড় কথা নয়, লক্ষ্যণীয়, নন্দিনী বলেছে, 'আমার এ মৃত্যু'; সে মৃত্যু তো রাজার মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। সে মৃত্যু জীবনধারণের ফলে নয় —শত শত রাজার জীবন লাভের জন্যই। তাই তার আত্মাহুতির যজ্ঞতেজ জমা হয়ে থাকে। আর একথা তো পরিস্কার যে,নন্দিনীর শরীরী উপস্থিতিতে যে অস্তিত্বের ব্যক্তিরূপ, সৌন্দর্যের যে বিচ্ছুরণ, সে অস্তিত্ব আর সৌন্দর্যের গভীরে সত্য আছে বলেই তার প্রকাশ সম্ভব, তাই মাধ্যম হিসেবে, যদিও দেহকে বিসর্জন দিতে হয় নন্দিনীদের, ঐ সত্যের তাপটা জেগে থাকে। তার মৃত্যুর কথা বলে নন্দিনী এই কথাটাই শুধু রাজার কাছে নয়, আজকের মানুষের কাছেও উজ্জ্বল করে দিয়ে গেল: যখন আমাদের পরিণতি

আজ মৃত্যুতে, নন্দিনীর হাতে তাই অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

আজ যখন শক্তির বিভূতি আমাদের সবার কাছেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অল্প বিস্তর লোভনীয়, তখন আমাদের সবচেয়ে বড় পরাজয়টাতো ঐ রাজারই মত। তারই মত তো আমাদের এড়িয়ে যায় সহজের ভেতরকার প্রাণের জাদু, নন্দিনীদের প্রাণভরা খুশির আনন্দ, ভালবাসার আবির। এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়াতেই তো চেতনায় সেই বিস্ফোরণ ঘটা সম্ভব—যে চেতনার কথা হার্ডিও বলেছিলেন, "Consciousness, the will informing till it fashions all things fair"[২৬] যাতে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়? আসলে আমাদের অনেকেই 'কাছের পাওনাকে' নিয়ে অনেক কিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু 'দূরের পাওনা'কে নিয়ে যে দুঃখের আগুনে জ্বলেছিল বিশু, সে দুঃখেই বিপ্লব আসে, সে দুঃখেই জেলখানার ভেতর বসে নন্দিনীরা নতুন করে কথা বলে ওঠে হো চি মিনের কবিতায়: "গোলাপ ফোটে গোলাপ ঝরে যায় / জানেও না সে কী করে। /জেলখানায় গোলাপের গন্ধ ভুল করে ঢুকে পড়লেই / কয়েদীর বুকে গর্জন করে ওঠে / দুনিয়ার সমস্ত অবিচার।"[২৭] আর এ যুগে দাঁড়িয়ে নেরুদা বলেন: "From sun to sun I forge the keys."[২৮]

তাই আজকের মকররাজেরা রক্তকরবীর রাজার মত নন্দিনীর হাতে মরতে চাইবে না হয়তো। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন রাজার মত আমাদের নিজেদের কাছে নিজেরই মরা,যাতে পাথর চাপা ঝর্ণার মতো যে নন্দিনীদের অস্ফুট প্রবাহ বুকের তলায় চাপা পড়ে অন্ধ হয়ে কাঁদে, তাদের জেগে ওঠার সময় আসে। বিশু তো নন্দিনীর কাছে থেকে পাওয়া তার 'চোখের জলের জোয়ারে' পেয়েছিল সত্যের সেই উদ্ভাসিত প্রবাল: "আমি রঞ্জনের ওপিঠ যে পিঠে আলো পড়ে না , আমি অমাবস্যা," অন্ধকারের মধ্যেও এ সত্য কিন্তু আমাদের কাছে আসে এক বড়ো প্রত্যয় আর আত্মস্বরূপের প্রোজ্জ্বল উদ্ভাসন হয়ে। কারণ এ অন্ধকারের গভীরেই তো নিহিত থাকে আলোর জন্য তৃষ্ণা, তাই না বিশুর চোখে লাগে জলের জোয়ার?

আমাদের অন্ধকারের ওপিঠই যে আলো- সে আলোর সন্ধান মেলে যদি অন্ধকারের স্বরূপটাও আজ আমরা চিনে নিতে পারি, যেমন চিনেছিল বিশু,কেননা, সে বুঝেছিল 'কাছের পাওনার দুঃখ' তার নয়,তার দুঃখ 'দূরের পাওনা' কে নিয়েই—তার দুঃখ তাকে সে দূরের স্বরূপ চিনিয়ে দেয় একদিন,তাই দুঃখ তাকে গড়ে তোলে, অন্ধকারে হারিয়ে যায় না সে। কিন্তু আমরা আমাদের দুঃখের, আমাদের অন্ধকারে স্বরূপটাও ঠিক জানি না। "It is the tragedy of will that does not understand itself, the unconsicous individual, who is slave to he knows

not what"[১১]— দুঃখ করেছিলেন কডওয়েল্। হয়তো এ দুঃখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আধুনিক চেতনার একটা দিক , কিন্তু এই দুঃখই তো আধুনিকতার পুরো চরিত্র নয়। তার আরও একটা দিক আত্মসন্ধানের চেষ্টায়, সেখানেও রক্তকরবীর মধ্যে সূত্র খুঁজে পাই আমরা,কেননা নন্দিনী যখন রাজাকে বলে, ''সে নাচের তাল আলাদা,তুমি বুঝবে না"—তখন উন্মুখ হয়ে ওঠেন রাজা এই আর্তিতে ঃ ''বুঝবো, বুঝতে চাই।" এই আত্মসন্ধানের চেষ্টায় আমাদের অন্ধকারের রহস্য কিছুটা স্পষ্ট হয়ে আসে ঐ রাজা আর বিশুর মধ্যে দিয়ে। রাজা শুধু শক্তির দিকেই, জোরের দিকেই, ঝুঁকতে চান বলেই, নন্দিনীর প্রাণভরা খুশীকে নিজের করতে পারেন না—"all broken truths are evil" যেমন বুঝিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর"The Religion of Man"-এ।আমরাও কি আজ তেমনি একমুখী হয়ে পড়ছি না ? তাছাড়া, অনেকদিন পরে বিশু যেমন একদিন সত্যি কথা বলে নিজের মুখোমুখি হয়, আর বলতে পারে ''বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবেই মুক্তি"—আমাদের তেমন সততা কোথায় ? অবশ্য, বিশুর সমস্ত জড়তায় আগুন জ্বেলেছিল ঐ নন্দিনী—একই কাজ যত টুকু করতে পারে 'রক্তকরবী' আমাদের চেতনায়, ততটুকুই আজ তার থেকে আমাদের প্রাপ্তি।

প্রসঙ্গ সূত্র

(১) " Canons buried in flowers" -- এই নামে সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ,অশোক মিত্র সম্পাদিত "The Truth unites" বইতে প্রকাশিত।

(২) "The people"- পাবলো নেরুদা; "Fully Empowered" বইতে মুদ্রিত।

(৩) "Explorations- Yeats"

(৪) "Debit & Credit -- কোয়াসিমোদো।

(৫) " The Word"- পাবলো নেরুদা ; "Fully Empowered" বইতে মুদ্রিত।

(৬) তদেব।

(৭) "An Acre of grass-" ইয়েট্স "Selected Poetry" (সম্পাদনা A.N Jeffares)

(৮) "Four Quartets" — টি.এস.এলিয়ট।

(৯) তদেব।

(১০) ''ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ" —শঙ্খ ঘোষ।

(১১) "The Situations of Poetry"- জে.মারিতাঁ এবং আর মারিতাঁ

(১২) ''শার্ল বোদলেয়ার ও তাঁর কবিতা"— বুদ্ধদেব বসু

(১৩) "Fully Empowered"- পাবলো নেরুদা।

(১৪) "সার্ত্র ও তাঁর শেষ সংলাপ"— অরুণ মিত্র অনূদিত।

(১৫) "রাশিয়ায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রচর্চা "— এই নামে ডঃ দানিয়েলচুকের ভাষণ (৪।২।৮৪ তারিখে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কলেজে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ; দ্রষ্টব্য ঃ "বিদ্যামন্দির পত্রিকা — ১৯৮৩-৮৪, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ।")

(১৬) "Lorca-A Collection of Critical Essays- সম্পাদনা ঃ ম্যানুয়েল দুরান।

(১৭) তদেব।

(১৮) "Brecht-A Collection of Critical Essays- সম্পাদনা ঃ পিটার দিমেৎজ।

(১৯) "১৬টি সাক্ষাৎকার " — সম্পাদনা উত্তম চৌধুরী।

(২০) "যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দমীমাংসা"— সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২১) "The Religion of Man"-- রবীন্দ্রনাথ।

(২২) তদেব।

(২৩) তদেব।

(২৪) "Treasured writings of Kahlil Gibran"

(২৫) "কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক"— শঙ্খ ঘোষ।

(২৬) "অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার"—"ষোলটি সাক্ষাৎকার"; সম্পাদনা উত্তম চৌধুরী।

(২৭) "জেলখানার কড়চা"— হো.চি মিন।

(২৮) "Fully Empowered" — পাবলো নেরুদা।

(২৯) "Illusion and Reality"—ক্রিস্টোফার কড্ ওয়েল।

(সৌজন্য : 'পরিচয়'; জুলাই ১৯৮৬,
শ্রাবণ ১৩৯৩ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত
লেখকের অনুমতিক্রমে)

রবীন্দ্রভাবনায় 'মেঘদূত'

স্বাতী সরকার
সংস্কৃত বিভাগ

সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' বৈচিত্র্য পিয়াসী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি মননে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছে। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আকাশে প্রবহমান একখণ্ড মেঘ মহাকবির মনের ভিতরে যেমন সঞ্চারিত করেছিল নতুন অনুভূতি ও 'মেঘদূত' কাব্যের সৃষ্টি সম্ভব করেছিল , তেমনি এই কাব্যটিও রবীন্দ্রমানসে স্থান করে নিয়ে আর এক নতুন সৃষ্টির জন্ম দিয়েছিল। তারই বিচিত্র প্রকাশ নানা ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

প্রেম ও সৌন্দর্যপিপাসা যতদিন আছে, কালিদাসও ততদিন থাকবেন। চিরকালীন কবিরা একটা দিব্য ভাবের আবেশ অন্তরে অনুভব করেন এবং সেই ভাবাবেগ থেকেই কবিতার জন্ম। প্রেম ও সৌন্দর্যের দিব্য প্রেরণা কালিদাসকে এভাবেই পরিচালিত করেছিল। বর্তমান রূঢ় বাস্তবের মালিন্যের মধ্যে বন্দী আধুনিক যুগের রোমান্টিক কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অপূর্ব সৌন্দর্যলোক অলকাপুরীতে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। উজ্জয়িনীতে বাস করেও কালিদাস যেমন করে তাঁর স্বপ্নের অলকাপুরীকে আহ্বান করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি কালিদাসের সমসাময়িক যুগটিকে আস্বাদন করেছেন। তাঁর 'মেঘদূত' প্রবন্ধে কালিদাসের যুগের প্রতি গভীর অনুরাগ তথা আকর্ষণই প্রকাশ পেয়েছে। অতীত ভারতবর্ষের সেই বিদিশা- অবন্তী- উজ্জয়িনী, সেই রেবা- শিপ্রা- বেত্রবতী- নির্বিন্ধ্যার সৌন্দর্য স্বর্গ থেকে কবি যেন বর্তমান ভারতে নির্বাসিত। তাই কবি তাঁর প্রবন্ধে ব্যাকুল হয়ে কামনা করেছেন— " ঐ রেবা, শিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী- বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।"

রবীন্দ্রনাথ ' মেঘদূত' কাব্যের কল্পলোকের সৌন্দর্য উপভোগেই ক্ষান্ত নন, বরং কাব্যটির মধ্যে তিনি নতুন ভাবলোকের আবিষ্কার করেছেন। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ ব্যাকুলতার মধ্যে দিয়ে সর্বকালের সকল মানুষের অতলস্পর্শ বিরহ - বিচ্ছেদের বেদনার করুণ বিলাপের সুর শুনেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিখ্যাত ইংরেজ কবি Matthew Arnold এর রচনা 'Poems of Marguerite' কবিতাটিকে স্মরণ করেছেন —

"প্রত্যেক মানুষই এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবনাক্ত সমুদ্র" প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চিরবিরহ বিদ্যমান। সর্বকালের প্রতিটি মানুষই যেন 'মেঘদূতের প্রভুশাপবিদ্ধ যক্ষ, মর্মান্তিক বিচ্ছেদের অভিশাপ নিয়েই আমরা চিরবিরহের রামগিরি এই মর্ত্যলোকে অবস্থান করছি। প্রেম সৌন্দর্যের অলকাপুরী থেকে চিরকালের জন্য আমরা নির্বাসিত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে মেঘদূতের বিরহ সকল মানুষের এক চিরন্তন বিরহের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'কেবলমাত্র অতীত আর বর্তমানের মধ্যেই দুস্তর ব্যবধান নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোমান্টিক কবি চেতনায় কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের আরও এক নতুন তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন— "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ বর্তমান।" তিনি আরও উপলব্ধি করেছেন যে আমরা যার সঙ্গে মিলিত হতে চাই, সে 'মানসসরোবরের অগম্যতীরে' বাস করছে; যেখানে কল্পনার পাখায় ভর করে মেঘকেই প্রেরণ করা যায়, সশরীরে সেখানে প্রবেশের কোনো উপায় নেই। আমরা পরস্পরকে দেখে বিরহে ব্যাকুল, নিজের হৃদয়ের গভীরে তার সন্ধান করি, এক হওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু মাঝখানে এই বৃহৎ পৃথিবীর ব্যবধান।" 'মেঘদূত' প্রবন্ধে সেই বিরহের মধ্যে চিরন্তনতার সুর ধ্বনিত হয়েছে।

'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থে 'মেঘদূত' - এ কবি বলেছেন, মহাকবি কালিদাস যেদিন মিলনের মণিকোঠার ভিতরে যৌবনের বিশ্বগ্রাসী অহমিকায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং যেদিন রাজকুলসহচরী এসে চামর ছত্র দ্বারা সেবা করত সেদিন কবি বর্হিজগত থেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন আত্মকেন্দ্রিকতায় । তারপর দেবতার অভিশাপের ন্যায় সেই সুরাজ্যে বিচ্ছেদের অমানিশা নেমে এল। আর সেইক্ষণে বিরহের ভিতরে বিশ্বজগতের সঙ্গে কবির অন্তরের মধুর যোগ স্থাপিত হয়ে জেগে উঠল মেঘদূতের বিরহ গাথা —

"সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ যবনিকা
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা,
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
দেখা দিল চারিদিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম; বিশ্ব সভা মাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।"

এও কালিদাস সম্বন্ধে কবির মৌলিক চিন্তাধারা। এখানেও আর এক কথা প্রচ্ছন্ন রয়েছে - যে কথা বলেছেন কবি অন্যান্য কবির সঙ্গে একই সুরে সুর মিলিয়ে তাঁর বহু কবিতার মধ্যে।

প্রিয়া মিলনে আমরা নিজেদের ভিতরে সংকুচিত হয়ে থাকি কিন্তু বিরহানলে চিত্তের

ঘটে নিঃসীম প্রসার। আর সেই প্রসারিত চিত্তের ভিতর দিয়ে বিশ্বমানবতার সঙ্গে তথা বিশ্বজগতের সঙ্গে আমাদের গভীর যোগসূত্র ঘটে। মিলনে আমরা নিশ্চল হয়ে এক ছোট্ট বাসকক্ষের চারিদিকে বাঁধা পড়ি। কিন্তু বিরহে সেই বেষ্টনী ভেঙ্গে যায় তখন আমরা সীমার বাইরে চলি তথা আমাদের প্রেম চলে। এ বিষয়ে কবি তাঁর ' পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'বিচ্ছেদ' কবিতায় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন।

" যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।"

" এটাই যে মেঘদূতের বড় কথা। মিলনে প্রেম চলেনা — তাই সে আনে আমাদের চিত্তের বন্ধন।" মেঘদূতের দিনে বাইরের জগতটা একান্ত অস্থির ভাবে চলমান হয়ে ওঠে। সংসারের সেই চলমানতার সঙ্গে যোগ দেয় আমাদের বিরহের চলা। আর এই চলার মুক্তি ব্যাথার ভারকে অবদমিত করে।

যক্ষের প্রেম যতক্ষণ বিরহে চঞ্চল হয়ে মেঘের মতন চলেছে , ততক্ষণ বেদনা নেই ; সেই প্রেম চলার আনন্দে উদ্বেল কিন্তু বেদনা দেখা দিল কৈলাসের অলকাপুরীর বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে। কারণ অলকাপুরীর নিরন্তর প্রতীক্ষমান প্রেম নিশ্চল। নিত্য পুষ্প, নিত্য জ্যোৎস্নার ভিতরেও যক্ষবধূ, সেখানে একা অর্থাৎ একান্ত বিরহিনী। যক্ষের প্রেম এখানে অপূর্ণ। এই অপূর্ণ-ই তো অভিসারিকা রূপে পূর্ণের দিকে ছুটে চলেছে নব নব আনন্দের পর্যায়ে। কিন্তু যে পূর্ণ সে একান্তই একাকী। সে তো পথ চলার আনন্দ থেকে চিরতরে বঞ্চিত, তার কেবল নিরন্তর অপেক্ষা তবে তার প্রতীক্ষার মধ্যেই আছে চলার আহ্বান। বিরহী অপূর্ণের চলা আর 'একাকী পূর্ণের' আহ্বান এই দুটি মিলে মিশে একই সুরে চলে সৃষ্টির ভিতরে।

এছাড়া 'শেষ সপ্তকে'র আটত্রিশ সংখ্যক কবিতাতেও বিশ্বকবি বলেছেন, 'একদিন যক্ষের প্রেম ছিল আপনার মধ্যেই বদ্ধ। যেমন গন্ধ থাকে পদ্মকুড়ির ভিতরে। সেদিন সংকীর্ণ সংসারে একান্তে ছিল যক্ষের প্রেয়সী এবং সম্ভোগের আলিঙ্গনের ভিতরেই হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রেয়সীকে। যেমন করে চাঁদকে শ্রাবণের ঘন মেঘ আপনার আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে হারিয়ে ফেলে। তারপরে ——

" এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে।
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে বাঁধা
পাপড়ি গুলি,

সে প্রেম নিজের পূর্ণরূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।"

শুধু তাই নয়, মিলনের আশ্রয় যে প্রিয়া, সে ছিল রক্তমাংসের প্রিয়া ; বিরহে যক্ষ নিজের অন্তর আঙিনায় গড়ে তুলেছে প্রিয়ার অপূর্ব মূর্তি। এই মানস প্রতিমাই কোণের সঙ্গিনী মানব-প্রতিমারই রসরূপ। 'মানসী' কাব্যে ও 'শেষ সপ্তকের' কবিতা গুলির মধ্যে 'যক্ষ' কবিতাটিতেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

'নবজাতকের' 'সাড়ে নটা' কবিতার মধ্যে কবি মেঘদূতকাব্যের এক অসাধারণ দেখিয়েছেন।

" যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত
বাণী মূর্তি সেও একা।"

বর্তমানের সীমার মধ্যে মানুষের প্রেম বেদনা ও মোহভঙ্গের দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ। সবকিছুই অধীন। মর্তলোকের কোন কিছুই চিরকালীন নয়। তাই অক্ষয় রূপ ও শাশ্বত আকুলতায় মানবচিত্তে চিরপিপাসা। এ পিপাসা অন্তহীন। বাস্তব সংসারে বদ্ধ অমোঘ হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে সে আর কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পায় না। তাই ' কাব্যগ্রন্থের 'মেঘদূত' কবিতায় কবি বলেছেন —

" ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান-
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?"

মানবহৃদয়ের সৌন্দর্যপিপাসার এই অনিবার্য ট্রাজেডি ভুলবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের চির আনন্দময় অলকাপুরীর স্বপ্নলোকে পথ অনুসন্ধান করেছেন।

'পুনশ্চ' এর 'বিচ্ছেদ' কবিতার মধ্যে যে কথা বলেছেন কবি 'মেঘদূত' প্রসঙ্গে, নবরূপ দেখতে পাওয়া যায় 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'যক্ষ' কবিতার মধ্যে। পূর্ণতার সৃষ্টির যে একটা পার্থক্য রয়েছে বিরহের ব্যাকুলতাই জীবনমরণের ভিতর দিয়ে সৃষ্টির উত্তরণ ঘটাচ্ছে ঃ

" ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন জ্বলে এই বিরহেই।"

কালিদাসের কাব্যে যা অস্ফুট, বা আভাসে ইঙ্গিতে সাঙ্কেতিক অথবা কালিদা
অর্থ একেবারেই ভাবেন নি, রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনাকেই আবিস্কার করেছেন। কালি
বলেছেন — " মেঘালোকে ভবতি সুখিনঃ অপি অন্যথাবৃত্তিঃ চেতঃ"; রবীন্দ্রভা
এটিই মূলকথা।

আমন্ত্রিত রচনা

'গীতবিতান' -এর গান

অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী গোস্বামী
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়

বাঙালীর প্রাণের ভাষা মনের কথা প্রাণ পায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালীর প্রাণের সম্পদ। বাংলার প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষ, মানুষের জীবনছন্দ, ঋতুবৈচিত্র্য, মর্মানুভূতি,সবকিছুরই বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে এই গানে। সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, হৃদয়যন্ত্রণা — এই শত সহস্র আবেগ অনুভূতিকে প্রকাশ করা হয়েছে এখানে। উদ্বোধিত হয়েছে আমাদের চিত্ত বিশ্ববীক্ষায়। রবীন্দ্রনাথের গান জীবনের পরতে পরতে এক আশ্চর্য রূপপরিক্রমা। কেবল ব্যক্তির জীবনেই নয়, বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনেও রবীন্দ্রসঙ্গীত যে বিরাট স্থান জুড়ে আছে তা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদগ্ধ মানুষ জন শিক্ষার সামান্য আলোক প্রাপ্ত মানুষ, আজকের দিনের সকলেই গান শোনেন, কেউ কেউ চর্চাও করেন। ২৫শে বৈশাখ বা ২২শে শ্রাবণকে ঘিরে শহর কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের গান সবার মুখে মুখে। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই কেন, সারা ভারতেই বাংলা ভাষা চর্চার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গান তার সুরের মাধুর্যে, ভাবের গভীরতায়, কথার আবেষ্টনীতে বেঁধে ফেলেছে বাংলা ভাষাভাষী বহু মানুষকে।

বর্তমান ভোগসর্বস্ব ব্যস্ত আধুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকট হচ্ছে মূল্যবোধের অবনতি। সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের সাধনা থেকে মানবমন আজ অনেক দূরে। চিরায়ত সম্পর্কবন্ধনগুলোও প্রায় ছিন্ন হয়ে যেতে বসেছে। বিপন্ন জাগতিক তথা মানবিক পরিবেশ। এই বিপন্ন মুহূর্তে 'গীতবিতান' এমন এক অমৃতবাণীর সংকলন, যাকে আশ্রয় করে বোধহয় আবার নতুন করে আনন্দস্নাত হওয়া যায়। 'গীতবিতান' —এর গান কেবল কাব্যমূল্যেই নয়, বিপন্ন জীবনচর্যার আনন্দময় প্রেক্ষাপট হিসেবেও স্বতন্ত্র মূল্যায়নের দাবী রাখে। শুধু কথা, সুর, তাল, ছন্দই নয় — ক্ষুদ্রতার তুচ্ছতার সীমানা ভেঙ্গে জীবন অতিক্রমী এক মহাজীবনের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেয়। জীবনের গভীর উপলব্ধির সহজ প্রকাশ এর গানগুলি। এই গানগুলো সন্ধান দেয় এক মুক্ত উজ্জ্বল আকাশের। জীবনকে শুভবোধে জাগ্রত করতে হয়ে উঠতে পারে জীবনচর্যার অঙ্গ।

কপিরাইট চলে যাবার পর রবীন্দ্রসঙ্গীত তথা সাহিত্য নিয়ে অনেকেই নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। সিরিয়াল, মেগা সিরিয়াল, টেলিনাটক, টেলিফিল্ম সর্বত্র যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে, তেমনি অনেকেই রবীন্দ্রনাথের গানের বন্ধনমুক্তি (?) ঘটাবার জন্য নিজস্ব পরিকল্পনায় সজ্জিত করতে চাইছেন গান গুলিকে। কখনও কথার, কখনও আঙ্গিকের নতুন বিন্যাস আসছে। অতি উৎসাহের ফলশ্রুতিতে তাঁরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও অনেক সময় অতিক্রম করে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা কতটা যুক্তিযুক্ত, কাল তার বিচার করবে। তবে স্বয়ং কবির প্রতি শ্রদ্ধায় একথা আমরা ভুলে যেতে পারি না যে একালের পক্ষেও অন্যতম আধুনিক কবি এবং সুরকার রবীন্দ্র বারবার তাঁর গানকে তাঁর মত করেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। অনেক মানুষের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ও বাণী পৌঁছে যাক্ এটা আমাদের কাম্য তবে তা বিকৃত না হলেই হ'ল।

গীতবিতান সংকলিত হবার আগে 'রবিচ্ছায়া' নামে একটি গীতসংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে। এরপর ১৩০০ সালে মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলী। এ গ্রন্থে গান ও ব্রহ্মসঙ্গীত সংকলিত হয়। 'ভাবের অনুষঙ্গতা' থেকে কাব্যগুলি পুনর্বিন্যস্ত হয় অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'কাব্যগ্রন্থ' নামে। এই কাব্যগ্রন্থের অষ্টম খণ্ড ছিল 'গান'। 'গান' শিরোনামে গীতগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হল ১৩১০ সালে। ১৩১৫ সালে প্রকাশিত 'গান' গ্রন্থের সংকলনে গানের সংখ্যা ছিল ৫২৮টি। এই সংগ্রহের মধ্যে স্বদেশী যুগে রচিত 'বাউল' এর গানগুলি ছিল। ১৩১৬ সালে 'গান' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে রয়েছে ৭২৭টি গান। এই সংস্করণের গানগুলিকে ভাব বা বিষয়ের সমতার দিকে লক্ষ্য রেখে সজ্জিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যথা — প্রকৃতি সঙ্গীত, ঋতু সঙ্গীত, ভাব-প্রধান সঙ্গীত। ব্রহ্মসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীতকেও ভাব অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করবার চেষ্টা হয়েছে। ১৩৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর জন্মপূর্তি উৎসব উপলক্ষে তাঁর যাবতীয় গানের একটি সংগ্রহ প্রকাশের আয়োজন হয়। এটিই 'গীতবিতান' নামে পরিচিত হয়।

১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে 'গীতবিতান' গ্রন্থের প্রথমাংশ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) এবং ১৩৩৯ এর শ্রাবণ মাসে দ্বিতীয়াংশ (তৃতীয় খণ্ড) শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এই প্রথম সংস্করণে গীতবিতানের গানগুলিকে গ্রন্থ প্রকাশের কাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। পাঠ পরিচয়ে সম্পাদক সুধীরচন্দ্র কর লিখেছেন— কৈশোরের পর্যায়ের গান হইতে বসন্ত গীতিনাট্য অবধি মোট ১১২৮টি গান লইয়া গীতবিতানের প্রথম ও

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। কবির নির্দেশমত এই সংগ্রহ হইতে ১৪১টি গান বাদ পড়িল। ইহার গোড়ার দিকে অনেকগুলি গান ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীর ক্রম অনুসারে সাজানো হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ গীতিগ্রন্থ 'বসন্ত' রবীন্দ্রনাথ তরুণ কবি নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন। গীতবিতান এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩০ সাল পর্যন্ত গানের সংগ্রহ। ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়। এই খণ্ডের প্রথমেই ছিল প্রবাহিনী কাব্যের গানগুলি। এতে ছিল ১৭৭টি গান। তাছাড়া গৃহপ্রবেশ, চিরকুমার সভা, নটীর পূজা, রক্তকরবী, গীতমালিকা প্রথম দ্বিতীয় খণ্ড সব মিলিয়ে ১২১টি গান। প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের গানের সংখ্যা ছিল ১৪৮৫টি।

প্রথম প্রকাশ কালে গীতবিতান কাব্যানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়। কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথকে খুশী করতে পারে নি। তাঁর চেতনার জগৎ কখনও তথ্যের নীরস বন্ধনকে মেনে নিতে চায়নি, ফলে দ্বিতীয় সংস্করণে আসে ভাবের অনুষঙ্গে বিন্যাস। প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সংকলন' কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গান গুলির মধ্যে কালানুক্রমিকভাবে শৃঙ্খলাবিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে ক্ষতি হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধের ক্ষতি করেছিল। তাই জীবনের শেষাহে তাঁর প্রায় দু'হাজার গানকে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে সাজিয়ে গীতবিতানের নূতন রূপ দান করলেন। এখানে বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীকরণের মতোই গীতবিতানের গানগুলিকে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। 'গীতবিতান' গ্রন্থের এই বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসে বয়ঃক্রম অনুযায়ী রচনার ধারা স্পষ্ট না হলেও, ভাবের অনুষঙ্গের এই বিন্যাসে অধ্যাত্মচেতনা বা প্রেমচেতনার ক্রম স্তর চোখে পড়ে।

'গীতবিতান' গ্রন্থের ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে 'পূজা' পর্যায় ২১টি উপপর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রেমের গানে দুটি স্তর ছিল, আর প্রকৃতির বিভাজন ছিল ঋতুভিত্তিক। স্বদেশের গানে কোন উপপর্যায় ছিল না, আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের সব গানে গভীরতার সব দিকটি ধরা না পড়লেও তা বিচিত্র পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। তবে গানগুলির কাব্যিকতার সর্বজনীন অনুভূতি থাকার জন্য অবলীলায় যে কোন পর্যায়েই তাদের বিন্যস্ত করা যায়।

পূজার ২১টি উপপর্যায় এর বিশেষত্ব একটি করে গানের উদাহরণে বোঝানো যেতে পারে।

পূজা — দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে

বন্ধু	—	শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়
প্রার্থনা	—	আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও
বিরহ	—	আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে
সাধনা ও সংকল্প	—	আমার যা আছে আমি সকল
দুঃখ	—	হৃদয় আমার প্রকাশ হ'ল অনন্ত আকাশে
আশ্বাস	—	আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে তবু শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।
অন্তর্মুখে	—	চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে
আত্মবোধন	—	দাঁড়াও মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
জাগরণ	—	মন জাগ মঙ্গললোকে
নিঃসংশয়	—	তুমি যে আমারে চাও, আমি সে জানি
সাধক	—	নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা
উৎসব	—	ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর
আনন্দ	—	বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা
বিশ্ব	—	মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে
বিবিধ	—	ডুবি অমৃতপাথারে
সুন্দর	—	একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ
বাউল	—	আমি কান পেতে রই
পথ	—	পান্থ, তুমি পান্থজনের সখা
শেষ	—	মধুর তোমার শেষ যে না পাই
পরিণয়	—	দুটি হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
প্রেম	—	দিয়ে গেনু বসন্তের এই গান খানি
প্রেমবৈচিত্র্য	—	বাজিল কাহার বীণা
স্বদেশ	—	অয়ি, ভুবনমনমোহিনী
	(১) গ্রীষ্ম	— চক্ষে আমার তৃষ্ণা
	(২) বর্ষা	— ছায়া ঘনাইছে বনে বনে
	(৩) শরৎ	— শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
	(৪) হেমন্ত	— হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী
	(৫) শীত	— এল যে শীতের বেলা

(৬) বসন্ত — দিয়ে গেনু বসন্তের এই
আনুষ্ঠানিক — বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজো হে।
বিচিত্র — কেন যে মন ভোলে, আমার মন জানে না।

কবি স্বয়ং এই উপপর্যায়- বিভাজন সম্পর্কে বলেছিলেন এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন। কবির এই উক্তি প্রমাণ করে যে গীতবিতানের গানগুলিকে কবি সুরের সহযোগিতা ছাড়াও গীতিকবিতারূপে পাঠকদের সমাদরের উপকরণ হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন।

এভাবেই গীতিবিতান-এর গানগুলি পড়লে আমরা লক্ষ্য করি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রতিটি গানকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা। অসাধারণ শব্দ চয়ন যেমন রয়েছে, তেমনি অসাধারণ কিছু চিত্রকল্প গানগুলিকে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত করেছে। বিষয়ানুসারে 'গীতবিতান' গ্রন্থে যে পর্যায় ও উপপর্যায়গুলি রয়েছে তা সবসময় যে স্পষ্ট চিহ্নিত এমন বলা যাবে না, পূজা পর্যায়ের কোন গানে যেমন প্রেমানুভূতির প্রকাশ রয়েছে, তেমনি প্রকৃতি পর্যায়ের গান প্রেম পর্যায়ে সহজেই সংযুক্ত হতে পারত। 'কেন যে মন ভোলে, তাহা মন জানে না' গানটি বিচিত্র পর্যায়ে রয়েছে কিন্তু একে প্রেম পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত গান হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই ভাবানুষঙ্গের বৈচিত্র্য সন্ধান করতে গিয়ে নতুন আর একটি দিক উদঘাটিত হয়। মনে হয় গীতবিতান যেন এক অখণ্ড জীবনধারা।

গীতবিতান-এর গান গুলি গভীরভাবে পাঠ করলে দেখা যায় এই গানগুলিতে একদিকে যেমন রয়েছে আমিত্ববোধ, অন্যদিকে রয়েছে বিশ্বজনীনচেতনা। অধ্যাত্মচেতনা ও মানবিকতা, হাস্যরস ও দুঃখবোধ, মৃত্যু ও জীবন, প্রভাত, সন্ধ্যা ও রাত্রি এই রকম বহু বিপরীত প্রসঙ্গ গানগুলিতেনানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। স্মৃতি ও বিস্মৃতি, প্রতীক্ষা ও প্রতীক্ষাবসান, সংকোচ ও সমর্পণ, বাস্তবতা ও স্বপ্নময়তা জীবনের নানা উপলব্ধি, অনুভূতি, মুহূর্তের এই সহাবস্থান থেকে স্বভাবতঃই মনে হয় কেবল পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়জাত পর্যায় বিভাজনই নয়, আরও গভীর ও ব্যাপক স্তরে এই কাব্যানুসারী বিভাজন ঘটলে সাধারণের উপলব্ধিতে সহায়ক হতে পারত। পূজা, প্রকৃতি বা প্রেম পর্যায়ের যেসব গানে সমর্পণের আভাস আছে যেমন — (১) ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা বা (২) আমি রূপে তোমায় ভোলাব না—গানগুলি নিবেদন পর্যায়ভুক্ত হতে পারে তেমনি 'ওই শুনি যেন চরণধ্বনি রে' বা 'আমি কান পেতে রই' প্রভৃতি গান 'প্রতীক্ষা' পর্যায় সংশ্লিষ্ট হতে পারে। গীতবিতান গ্রন্থে ভাবানুষঙ্গভিত্তিক এই নিখুঁত পর্যায় বিভাজন একদিকে যেমন গানগুলির কাব্যাংশ পাঠে সাধারণ পাঠকদের মনোযোগী

করে তুলতে পারে, তেমনি বিভ্রান্তিও দূর হতে পারে। 'আমারে যে জাগতে হবে/ কী জানি সে আসবে কবে / যদি আমায় পড়ে তাহার মনে' এই অংশটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা থাকলে 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' গানটি আর পিকনিকের উচ্ছ্বাসে পরিবেশিত হবে না। এভাবেই বৌদ্ধ অনুষঙ্গ, বিজ্ঞান চেতনা গীতবিতানে আলাদা ভাবে চিহ্নিত হতে পারে।

বাংলার মাটির সুরে গাঁথা বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী, সারি গানের বৈশিষ্ট্য নানা ভাবে এসেছে তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথের লোকায়ত চেতনা এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে কখনও বাউল গান সরাসরি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনও বা স্বদেশ পর্যায়ের গানে। 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির প্রভাবে লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় ভাবকে বুঝিয়ে দেয়। এই লোকায়ত ভাবনার স্পষ্ট উল্লেখ গীতবিতান গ্রন্থে থাকলে কাব্য হিসেবে গানগুলি আরও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারত।

স্বাধীনতালাভ, দেশভাগ, সামাজিক অবক্ষয়, মানবিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন — রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সবক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃতির স্তরে এই পরিবর্তন আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির হাত ধরে একদিকে যেমন আমরা প্রযুক্তির যুগে পৌঁছেছি, তেমনি বিশ্বায়ন, ধনবন্টনের গভীর বৈষম্যে নৈতিক আদর্শ, সনাতন বিশ্বাস পুরোনো বাড়ির পলেস্তারা খসার মত খসে পড়ছে। 'আমার যে সব দিতে হবে' — এ গান আজ আর লোকের মুখে যেন ফেরে না, পরিবর্তে 'আরো চাই গো — আরো যে চাই' সাধারণ অর্থে গৃহীত হয়। 'দিবসরজনীর বাঁশি পুরে' — যে গান বাজে অসীম সুরে / তারে আমার প্রাণের তানে বাজানো চাই' এই শেষ পংক্তিদ্বয় যে ভিন্ন তাৎপর্যে কবি ব্যবহার করেছেন তার দিকে মনোনিবেশ করেন না অনেকেই ।

তবু উগ্র আধুনিকতার যুগে দার্শনিক মননযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রচার প্রসার আমাদের কিছুটা বিস্মিত করে। কিছুটা আশাপ্রদও করে সঙ্গে সঙ্গে। আসলে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের সামাজিক অস্তিত্বের আধার হয়ে উঠেছে। গভীর সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষ যেমন কোন কিছুর অবলম্বনে বাঁচতে চায়, ঠিক সেই রকমই রবীন্দ্রনাথের গান যেন 'শেষ পারাণির কড়ি'। গীতবিতান' তার ভাণ্ডারঘর। সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ, পরিবেশ সবকিছুর উন্নতির মূলে রয়েছে মানসম্পদের উন্নয়ন। মানুষের আত্মিক উন্নয়ন, জীবনবোধের উজ্জীবনে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে এই গ্রন্থ।

"খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা শৃঙ্খল"

চন্দনা সামন্ত

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ জীবনের বেশীর ভাগ সময় পরমব্রহ্মের অনুধ্যানে রত ছিলেন। সারা জীবন রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের এবং দেহের মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান করেছেন। হৃদয় মন দিয়ে মহাকালের লীলার বিচিত্র রূপ তিনি উপলব্ধি করেছেন।

কবির উপলব্ধি যত গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, প্রকাশও তত বৈচিত্র্যময় হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। আর কবির ভাণ্ডার ফসলে ফসলে পূর্ণ হয়েছে। সেই ভাণ্ডারের সব ফসল হয়তো সোনার ফসল নয়, কিন্তু যা পাওয়া গেছে তার মূল্যায়নও সহজ নয়। রবীন্দ্র সৃষ্টি সমুদ্রে অবগাহন করলে তার থই পাওয়া দুষ্কর। তাই তীরে বসে এক অঞ্জলি জল তুলে নিয়ে তাতেই অবগাহনের চেষ্টা করি। জানি এ কাজ সহজ নয়। যিনি তাঁর গভীর উপলব্ধির নির্যাস তুলে ধরেছেন বিশাল সৃষ্টি-সম্ভারের মধ্যে তাকে স্পর্শ করতে হলে তো সেই উপলব্ধির কিছুটা অধিকারী হতে হয়। তা নাহলে অনেকটাই 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' নিজের মতো করে পরিবেশন করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দিয়ে যখন তাঁকে ছোঁয়ার চেষ্টা করি তখনই তাঁর বিশালতাকে আরও বেশী করে অনুভব করি। দুঃখের গভীর গহনে যখন নিমজ্জিত হই বা সুখের সাগরে ভাসতে থাকি তাঁর রচনাই আমাদের পথ দেখায়। অথচ এই মহাস্রষ্টাকেও ঘরে-বাইরে কত ব্যথা বেদনা সহ্য করতে হয়েছে। এই বেদনাই তাঁকে আরো বেশী সৃষ্টিশীল করে তুলেছে। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যটি রচনার পিছনেও এরকমই বেদনা ছিল। 'শিশু ভোলানাথ' রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য একটি কাব্য। কবির যখন ৬১বছর বয়স তখন তিনি 'শিশু ভোলানাথ'(১৩২৯) রচনা করেন। এই সময়ে কবিকে নানা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, স্যার উপাধি ত্যাগ, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা এবং আমেরিকা ভ্রমণ কবির চিন্তা ও কর্মকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল। 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলি লেখার উদ্দেশ্য কবি তাঁর 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে (যাত্রা) প্রকাশ করেছেন — ".....কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর

কিছুই নেই।.....পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ, — সে কিছুতেই জমতে দেয় না; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়—সে যে নিত্য নূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্য তার আকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়।

কিছুকালের জন্যে আমি ..... শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম, সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বহে,আমার ধ্যানে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম, বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে তার চিত্তের এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমন করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তার খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্য কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম , সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে মুক্ত করবার জন্যে।"

জীবনের প্রকৃত স্বরূপ শিশুস্বভাবের মতো সহজ-সরল, নির্মল, আত্মভোলা ও মুক্ত। ভোলানাথ বা ভগবানও শিশুর মতই। শিশু যেমন ভাঙা গড়ার খেলায় আনন্দ পান ভোলনাথও তেমনি এই বিশ্বসৃষ্টিকে একবার ভাঙছেন আর একবার গড়ছেন। ভোলানাথ বিশ্বেশ্বরকে আমরা অনুভব করতে পারি শিশুর স্বভাবের মধ্যে। আর তার মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি। সুতরাং শিশু জীবনকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই আত্মস্বরূপকে ও বিশ্বেশ্বরকে উপলব্ধি করা যাবে একথাই রবীন্দ্রনাথ 'শিশু ভোলানাথ'- এ বলতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে জীবনের সবকিছুই যে ক্ষণিকের এই বোধও এখানে প্রকাশিত। সুখ-দুঃখ-স্নেহ- প্রেম সবই তো সাময়িক। আর এই বিশ্বসৃষ্টির রহস্যই তো ভাঙা আর গড়া। আর এই ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়েই অখণ্ড লীলাবৈচিত্র্য সংঘটিত হয়ে চলেছে। ধ্বংসও যেমন সত্য, সৃষ্টিও তেমনি সত্য। আবার সৃষ্টি ও ধ্বংস দুটিই ক্ষণস্থায়ী। কবি ব্যক্তিগত জীবনের বেদনার ভার লাঘব করার জন্য সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে মনকে শান্ত করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে বাইরের নানা কর্মের জটিল পরিবেশ এবং বস্তুবাদী জগতের বস্তুসর্বস্বতার ভয়াল রূপ কবিকে যেভাবে পীড়িত

থেকে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শিশুর সহজ সরল স্বভাবের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে। শিশু যেমন আপন খেয়ালে তার খেলনা নিয়ে ভাঙা গড়ার খেলায় মেতে থাকে তেমনি ভোলানাথ বা ভোলা মহেশ্বরও এই বিশ্বকে নিয়ে ভাঙা গড়ার খেলায় মেতে থাকেন। কবিও শিশুর মতোই হতে চেয়েছেন—

" ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে;
দেরে চিত্তে মোর
সকল ভোলার ওই ঘোর ;
খেলেনা ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।

— ('শিশু ভোলানাথ')

শিশু তার খেলনা নিয়ে ভাঙাগড়ার খেলা খেলে, তাতে খেলার সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায় বা কিছু সৃষ্টি হয়, কিন্তু খেলা শেষ হয়না। খেলার ছন্দ আপন তালে চলতে থাকে। এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেও ঠিক একইভাবে ভাঙাগড়া চলতে থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের খেলা আপন নিয়মে চলে। তার শেষ নেই। কবি তাই বলেছেন—

ওরে, মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব;
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণিচক্র পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস অনর্গল
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা শৃঙ্খল। —'শিশু ভোলানাথ'

বিশ্বে সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরে রাখা যায় না। বিষয়ী মানুষ এই জীবনসমুদ্রে সবকিছুই আঁকড়ে ধরে থাকে। আর তাতেই দুঃখ বাড়ে। কিন্তু শিশু তা করেনা। সে সহজ সরল মুক্ত। কবি সেই শিশুমনের মধ্যে প্রবেশ করে সব কিছুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন। বস্তুসর্বস্ব জীবনে বেশীর ভাগ মানুষই প্রতিদিন

প্রতিমুহূর্তে বস্তুসংগ্রহ করে জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাতেও সে ক্ষান্ত থাকে না। বরঞ্চ —" কালকে দিনের ভাবনা এসে/ আজ দিনেরে মারলে ঠেসে / কাল তুলি ফের পরদিনের বোঝা"/ বর্তমানকে অনুভব করা সম্ভবই হয় না, শুধুই ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর থেকে বর্তমানকেও আমরা মাটি করে ফেলি। কবির ভাষায় — "ভবিষ্যৎ তো চিরকালই / থাকবে ভবিষ্যৎ / দুটি তবে মিলবে বা কোনখানে" ? কিন্তু "বুদ্ধিদীপের আলো" জ্বেলে তো এই বর্তমানের অন্বেষণ সম্ভব নয়। তাই কবি সাহসের সঙ্গে শিশু হবার সাধনা করতে চেয়েছেন— "শিশু হবার ভরসা আবার / জাগুক আমার প্রাণে / লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে / ভবিষ্যতের মুখোশখানা / খসাব একটানে, / দেখব তারেই বর্তমানের কালে । (শিশুর জীবন)

শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবনা নেই। অথচ শিশুর আনন্দেরও শেষ নেই । অল্পতেই সে তৃপ্ত। শিশু মন সব সময় বর্তমানেই বিরাজ করে। মনকে বর্তমানে স্থিত করতে পারলেই তো পরমানন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই পরম আনন্দের সন্ধানে তাই কবি কোন দুর দেশে বা অন্য কোন স্থানে পাড়ি দেবেন না, তিনি তাঁর আনন্দকে খুঁজে নেবেন," ছাদের কোণে পুকুর পাড়ে / জানব নিত্য অজানারে / মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা; / জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা / তৈরী হবে আমার খেলা / সুখ রবে মোর বিনামূল্যেই কেনা।" — (শিশুর জীবন)। কবি পৃথিবীর সব আনন্দটুকুই উপভোগ করে যেতে চান। তাই জীবনের হিসাব নিকাশের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে শিশুর মতো বেহিসেবী হয়েই থাকতে চান। তাই তো কবির কামনা "বাল্য দিয়ে যে জীবনের / আরম্ভ হয় দিন/ বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা ।" (শিশুর জীবন)। যে ধুলিময় পৃথিবীর বুকে জন্ম সেখানেই তো মানুষের আসল আশ্রয়। বস্তু মানুষের চাহিদাকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। তাতে না আছে শান্তি, না আছে পরিতৃপ্তি। কবি বস্তুকে অতিক্রম করতে চেয়ে বলেছেন — "বস্তু বলে কিছুই তো নেই। বিশ্ব গড়া যা খুশি তাই দিয়ে। (শিশুর জীবন)। কবি ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি জগৎ কে আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে চেয়ে ভোলানাথ এর কাছে প্রার্থনা করেছেন — "আবার ওগো শিশুর সাথি/ শিশুর ভুবন দাও গো পাতি / করব খেলা তোমায় আমায় একা / চেয়ে তোমার মুখের দিকে / তোমায়, তোমার জগৎটিকে/ সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।" (শিশুর জীবন)।

'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের কিছু কবিতায় শিশুর কল্পরাজ্যের ছবিই ফুটে উঠেছে। 'তালগাছ' কবিতায় শিশু কল্পনার ডানা মেলে দূর আকাশেতে পাড়ি দেয়। কিন্তু তার নিশ্চিত আশ্রয় তো মায়ের কোল। সেখানে সে ফিরে আসতে চায়। আমাদের শিশুমনও তো এরকম একটা আশ্রয়েরই কামনা করে। যেটা পাওয়া যায় ঈশ্বরের অনুভূতির মধ্যে

নিয়ে। 'বুড়ি' কবিতায় 'সাতশো হাজার কুড়ি' বছরের বুড়িও স্বপ্ন জগতে নিজের বয়স ভুলে গিয়ে মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। আর স্বপ্ন জগৎ ছেড়ে যখন সে বাস্তবে ফিরতে চায় তখন আর তার ফেরা হয়না। কারণ -"হেনকালে মায়ের মুখে / যেমনি আঁখি তোলে / চাঁদে ফেরার পথখানি যে তকখনি সে ভোলে।" 'রবিবার' কবিতায় দেখা যায় শিশুর মনে হয় সোম-মঙ্গল-বুধবার এরা খুব তাড়াতাড়ি আসে। কিন্তু রবিবার দেরি করে আসে। তার মনে হয় যে সোম-মঙ্গল-বুধের বুঝি হাওয়া গাড়ি আছে, তাই তারা তাড়াতাড়ি আসে, কিন্তু রবিবারের হাওয়া গাড়ি নেই। শিশু এখানেই থামে না। তার মনে প্রশ্ন জাগে অন্যদিনের হাওয়া গাড়ি আছে, রবিবারেরই বা নেই কেন? তাই সে বলে "সে বুঝি মা তোমার মতো / গরিব ঘরের মেয়ে?" এখানে একটি বাড়তি মাত্রা যুক্ত হলো কবিতাটির সঙ্গে এবং পরিধিও অনেকটা বেড়ে গেল। আবার 'পুতুলভাঙা' কবিতাতেও কবি শিশুর মুখ দিয়ে বড়দের নিয়ম নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। শিশু ভুল করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু গুরুমশায় ভুল করলে কি তিনি শাস্তি পান, তাই শিশু মায়ের কাছে প্রশ্ন রেখেছে— "ওঁর কি গুরু আছে?/ আমি যদি নালিশ করি / একখনি তার কাছে? কোনো রকম খেলার পুতুল /নেই কি মা ওঁর ঘরে? / ..... ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে/ ভাঙেন কেহ রাগে / বল্ দেখি মা, ওঁর মনে তা / কেমন তরো লাগে? এই প্রশ্ন শিশুর চিরকালের। 'সংশয়ী' কবিতায় মানবমনের চিরন্তন জিজ্ঞাসাই ব্যক্ত হয়েছে। কোথা থেকে এসেছি, কোথায় সেই দেশ। কবির ভাষায় বলা যায় সে দেশ আছে ...."সকল জায়গাতেই / সিধু মাষ্টার বলে শুধু কোনোখানেই নেই।"

'শিশু ভোলানাথ'-এ শিশুমনের কৌতুহল, কল্পনার বিচিত্র লীলা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি শিশুর সহজ সরল রূপের মধ্যে ভোলানাথকে উপলব্ধি করেছেন কবি। তাই 'শিশু ভোলানাথ' একই সঙ্গে শিশুদের এবং বড়োদেরও কাব্য হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :-

১) রবীন্দ্র রচনাবলী - সপ্তম খণ্ড বিশ্বভারতী

২) রবীন্দ্র কাব্যেপরিক্রমা - উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য

৩) রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ - প্রমথ নাথ বিশী

৪) রবীন্দ্র সরণী - প্রমথ নাথ বিশী

৫) রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও আমি (প্রবন্ধ)- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দেশ পত্রিকা।

চলচ্চিত্র-কল্পে রবীন্দ্রনাথ

ডঃ নিলয় কুণ্ডু
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

"দ্যাখো পঙ্কজ, আমি যদি এই কবিতাটায় সুর দিতাম, তাহলে তোমার মতোই হোত। সুরটা ভালই হয়েছে, আমার বেশ লেগেছে"। " দিনের শেষে ঘুমের দেশে " শোনার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সুরকার পঙ্কজ মল্লিকের দেহে - মনে এনে দিল পরম তৃপ্তি, এতোদিনে দিনু ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা চর্চা আজ তাঁর সার্থক। পাশেই বসে প্রমথেশ বড়ুয়া - দুইজনে এসেছেন গুরুদেবকে তাঁদের নতুন চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট শোনাতে। নির্বাক উত্তর বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন রবীন্দ্রসংগীত বহুল স্ক্রিপ্টে গানগুলির সঠিক প্রয়োগ ও মূল্যায়ন হয়েছে কিনা তা দেখাতেই এনেছেন গুরুদেবের কাছে। পুরোটা শুনে গুরুদেব তার নামকরণ করলেন "মুক্তি" (১৯৩৭) - যা পরে এক সাড়াজাগানো চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল।

তবে এটাই শুরু নয়, বাংলা চলচ্চিত্রে তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের গল্প চিত্রায়িত হয়েছিল। সেই কর্ম কাণ্ডে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন - তিনি সুকুমার বসু। ওরফে মধু বসু। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন রবীন্দ্রসান্নিধ্যে - পিতা ৺ প্রমথনাথ বসুর (Grand old man of Ranchi) ইচ্ছায় ভর্তি হয়েছিলেন বোলপুর "ব্রহ্মচর্য বালক বিদ্যালয়" এ (বর্তমানে শান্তিনিকেতন)। জার্মানি থেকে ক্যামেরার কাজ শিখে এসে কলকাতায় দেখা করলেন বিখ্যাত ম্যাডান কোম্পানির কর্তা জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডানের সাথে, প্রস্তাব পেলেন পরিচালক হয়ে নতুন ছবি তৈরীর। গুরুদেবের ছোট গল্পগুলি পড়তে পড়তে 'মানভঞ্জন' গল্পটি বেশ লাগল।

গেলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গুরুদেবের সাথে দেখা করতে। তিনি তাঁর সেই প্রিয় ছাদের ঘরটিতে বসে ছবি আঁকছিলেন তখন। প্রণাম করতেই খুশি হয়ে বললেন— সেই যে শান্তিনিকেতন থেকে চলে এলে, তারপর বোধ হয় আর যাওয়া হয়নি ? কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর মধু বসু নিজের উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করলেন ও বললেন "গল্পটি তো ছোট — আপনি যদি খানিকটা বাড়িয়ে টাড়িয়ে দেন তো বড় ভাল হয়।" গুরুদেব বললেন— তুমি একটা মোটামুটি খসড়া কর, তারপর আমি দেখে দেব। তার কিছুকাল পর বর্ধিত চিত্রনাট্যে গুরুদেব জায়গায় জায়গায় সংশোধন করে সংলাপ লিখে দিলেন। একদিন গুরুদেবই 'মানভঞ্জন' বদলে নায়িকার নামে চিত্রনাট্যের নাম রাখলেন

গিরিবালা'। এরপর গুরুদেব কিছুদিন ছিলেন না, তিনি বিদেশ থেকে ফিরতেই গিরিবালা'র মুক্তিদিবস ঘোষিত হলো ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমানে উত্তরা) ১ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০। গুরুদেব প্রথম দিনই দোতলার বক্সে বসে ছবিটি দেখলেন, বেশ ভাল লেগেছিল। বিশেষ করে একটি খারাপ লোকের চরিত্রে নরেশ মিত্র মহাশয়ের এবং নায়ক গোপীনাথের চরিত্রে নবাগত ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয় তাঁর বেশি ভাল লেগেছিল। ছবি মুক্তি পাওয়ার একদিন আগে ম্যাডন থিয়েটারে (বর্তমানে এলিট সিনেমা) একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন মধু বসু। তখনকার দিনের সমস্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সমালোচকদের আমন্ত্রণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের চিত্রায়নে মধু বসুর মুন্সিয়ানা ও নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য ও ললিতা দেবীর (মিস্ বনি বার্ড) অভিনয় প্রতিভা সেই নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রে সাড়া ফেলে দেয়। দ্য স্টেটসম্যান বেঙ্গলী, লিবার্টি ও অ্যাডভান্স (ইংরাজি) ও নাচঘর, ভোটরঙ্গ, বায়োস্কোপ, নবশক্তি (বাংলা) পত্রিকায় তার অকুণ্ঠ প্রশংসায় সিনেমা থিয়েটার বায়োস্কোপ বিমুখ তৎকালীন বাঙালী সামাজিক ভাবধারায় পুষ্ট, তারাও 'গিরিবালা' দেখে নিজেদের পরিতৃপ্ত করেছিল।

নির্বাক যুগে 'গিরিবালা'র আগে গুরুদেবের অনেক গল্প নিয়েই ছবি তৈরী হয়েছে যথা 'মানভঞ্জন' (১৯২৩) 'বিসর্জন' (১৯২৯), ' বিচারক ' (১৯২৯), তবে রবীন্দ্রনাথের সাথে সরাসরি চলচ্চিত্রের যোগাযোগ 'গিরিবালা' থেকেই শুরু। ১৯২৭ এ প্রথম 'নটীর পূজা' জোড়াসাঁকোয় মঞ্চস্থ হয় — যা ছিল 'পূজারিনী'র নৃত্যনাট্যরূপ। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সরকার ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত তাঁর 'হাতি-মার্কা' নিউ থিয়েটার' এর ব্যানারে গুরুদেবকে সেটি চলচ্চিত্রায়নের অনুরোধ করেন। পরিশেষে ১৯৩১ সালে দীনেন্দ্রনাথ (দীনু) ঠাকুরের আবহসংগীতে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ছাত্রছাত্রিবৃন্দ 'নিউ থিয়েটার' স্টুডিও তে অভিনয় করেন 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যটি। পরিচালনা করা ছাড়াও 'উপালি'র ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন। সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন নীতিন বোস। তবে নৃত্যনাট্যটি পুরোটাই স্থির রেখে। এই ১০০০ ফিট এর ফিল্মটি (প্রায় ৯০ মিনিট) প্রথম প্রিমিয়ার হয় 'চিত্রা থিয়েটারে' (অধুনা নিউ এম্পায়ার) গুরুদেবের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৩২ সালে। দুর্ভাগ্যজনক যে আজো আর সেই ফিল্মের সামান্য কিছু অংশ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। নিউ থিয়েটার্সের আগুন তার প্রায় পুরোটাই নষ্ট করেছে।

বর্তমানে ঋতুপর্ণ ঘোষের 'নৌকাডুবি' খুবই সুখ্যাতি লাভ করেছে কারণ গুরুদেবের এই ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গায়িত রচনাটি দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। তবে নৌকাডুবির' যাত্রা সেই নির্বাকযুগে। নরেশ মিত্র পরিচালিত গুরুদেবের 'নৌকাডুবি'

ম্যাডান থিয়েটার থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম সবাক (Talkie) ছবি হবার কথা ছিল, কিন্তু সময় মতো টকি মেসিন আমেরিকা থেকে এসে না পৌছনোয় এবং বিশ্বভারতী ফিল্ম রাইটের জন্য প্রচুর টাকা চাওয়ায় জাহাঙ্গীর সাহেব রেগে মেগে নরেশ বাবুকে বললেন — 'কুছ্ পরোয়া নেহি-নির্বাকি ই তোল'। ফলে রবীন্দ্রভাবনায় নিমজ্জিত আপামর বাঙালী আর একটি ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হলো।গুরুদেবের নৌকাডুবির বদলে অমর চৌধুরী পরিচালিত 'জামাই ষষ্ঠী' হোল বাংলা চিত্রজগতে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। নাম ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য — রমেশ, শান্তি গুপ্তা — হেমনলিনী, সুনীলা দেবী (বিখ্যাত অভিনেত্রী দেববালার ছোটবোন) — কমলা ও মিঃ রাজহন্স — ডাঃ নলিনাক্ষ। নৌকা ডুবে যাওয়ার দৃশ্যটি বিশেষ ভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৯৩১ সালে সিরাজগঞ্জের ভয়ংকর বন্যার সময় চিত্রায়িত হয় এবং চিত্রগ্রহনের সময় ধীরাজ ভট্টাচার্য ও সুনীলা দেবীর জলে ডুবে প্রাণ সংশয় হয়। এরপর নীতিন বোস ১৯৮৭ ও অজয় কর ১৯৭১ সালে গুরুদেবের একই গল্প চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত করেন। পরে নাম বদলে হিন্দি সেলুলয়েডে নীতিন বোস 'মিলন' (১৯৪৬) এবং রমানন্দ সাগর 'ঘুংঘট' (১৯৬০) চলচ্চিত্রায়িত করেন। অন্য আঙ্গিকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'দেবদাস' থেকে বেশি বার চলচ্চিত্রে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে।

এরপর আসতেই হয় 'দালিয়া' প্রসঙ্গে। যদিও গুরুদেবের এই নাটকটি মধু বসু চিত্রায়িত করেন তবে এটি বহুবার মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছিল। প্রথমবার ১৯৩০ সালে 'দালিয়া' মঞ্চস্থ হয় — নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তিন্নির ভূমিকায় সাধনা বসু ও দালিয়া — মধু বসু। কতকগুলি গান — 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী', 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ', 'না, নাগো না, কোরনা ভাবনা,' 'আবার এসেছে আষাঢ় ' এগুলি টি. ফ্রাঙ্গোপোলোর সাথে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রায় harmonise করা হয়েছিল। গুরুদের সেই সময় দেশে না থাকায় তাঁর মতামত নেওয়া যায়নি, তবে পরে ১৯৩৩ সালে যখন আবার 'দালিয়া' নিউ এম্পায়ার এ মঞ্চস্থ হোল, তার আগে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপের অনেক জায়গায় সংশোধন করে দিলেন এবং একখানি গানও নতুন লিখে দিলেন। এবার বিদেশী অর্কেস্ট্রায় টি. ফ্রাঙ্গোপোলোর সাথে দেশীয় অর্কেস্ট্রায় মিহির কিরণ ভট্টাচার্য (তিমিরবরণের অগ্রজ) যোগ দিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ এ এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমানে রঙ্গ) গুরুদেবের উপস্থিতিতে 'দালিয়া' উপস্থাপিত হল। গুরুদেবের শুধু ভালই লাগেনি, তিনি শেষ দৃশ্যে বৃদ্ধ ধীবরকে আবার মঞ্চে ফিরিয়ে আনলেন ও তৎক্ষণাৎ শেষ দৃশ্যের কিছু নতুন সংলাপ লিখে দিলেন।

নিউ থিয়েটার প্রযোজিত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত 'চিরকুমার সভা' ১৯৩২

সালে মুক্তি পায় ও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। নামভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তিনকড়ি চক্রবর্তী ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরে ১৯৫৬ সালে নেবকী বসু গুরুদেবের একই গল্প চিত্রায়িত করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে দেবদত্ত ফিল্মস্ এর ব্যানারে রিলিজ করল নরেশ মিত্রের 'গোরা'। গুরুদেবের এই বিখ্যাত উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নে সুরারোপ করেছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। 'চোখের বালি' প্রথমবার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় ১৯৩৭ সালে সতু সেনের পরিচালনায়। নিউ থিয়েটারে ১৯৩৭ সালে 'শেষের কবিতা' র চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরে ১৯৫৩ সালে ছবি বিশ্বাস ও উৎপল দত্তকে নামভূমিকায় রেখে মধু বসু আবার 'শেষের কবিতা'র চিত্ররূপ দেন।

এতো গেল রবীন্দ্রযুগের কথা। গুরুদেবের মৃত্যুর পর আরো অনেক নতুন গল্প উপন্যাস রুপোলী পর্দায় দেখা গেছে। ১৯৪২ সালে আসে গুরুদেবের 'শোধ বোধ' সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। বাংলা সিনেমা সবসময় রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে এগিয়েছে। বহু বিখ্যাত লেখকের গল্প উপন্যাস অবলম্বনে বহু বিখ্যাত ছবি তৈরী হলেও রবীন্দ্রনাথ নামক মধুভাণ্ডের আসেপাশে বারবার ফিরে আসতে হয়েছে বাংলার মউপিয়াসী প্রযোজক ও পরিচালকদের। তপন সিংহের 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৯৬০), হেমেন গুপ্তের 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৬১) দেশে বিদেশে প্রভূত সমাদৃত হয়েছে। রবীন্দ্র আবেশে নিমজ্জিত বিশ্ববন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প— পোস্টমাস্টার, মনিহারা ও সমাপ্তি অবলম্বনে তৈরী করেন 'তিনকন্যা' (১৯৬১)। রবীন্দ্রভাবনায় নারীসত্ত্বার ত্রিমুখী পরিস্ফুটন তাঁর এই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। পরে ১৯৬৪ সালে 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে তৈরী করেছিলেন 'চারুলতা' ও ১৯৮৪ সালে 'ঘরে বাইরে'। এছাড়া 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (১৯৬০) 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৯৭০), 'মাল্যদান' (১৯৭১), 'নিশিথে' (১৯৭০), 'স্ত্রীর পত্র' (১৯৭২), 'ইচ্ছাপূরণ' (১৯৭০), 'রবিবার' (১৯৯৬) এবং 'চোখের বালি' (২০০৩), প্রতিটি ছবিই রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিককে আলোক পাত করেছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ১০০টির বেশি ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস দারুণ ভাবে সমাদৃত হলেও কিছু ছবি দর্শকদের মন জয় করতে ব্যর্থ কারণ ভুল গল্প নির্বাচন। একবার পরিচালক মনি গুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' সিনেমা করবেন বলে ক্ষেপে উঠলেন। মালঞ্চ হল গুরুদেবের মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্প — ঘটনার বিশেষ ঘাত প্রতিঘাত নেই, যাকে বলে ড্রামাটিক ক্লাইমেক্স, তার একান্ত অভাব। তাই পড়তে ভাল লাগলেই তার চিত্ররূপ দেওয়া যায়না। কোন বিখ্যাত পরিচালক রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এক অনামী পরিচালকের হাতে ছবিটি absolute flop করে। তাই

দর্শক মন বুঝে এবং emotional continuity বজায় রেখে ছবি করায় গিরিবালা, নৌকাডুবি, চিরকুমার সভার মতো ছবি বার বার ফিরে এসেছে নতুন রূপে।

তবে রবীন্দ্রনাথের ভাল গল্প থেকে ভাল ছবি করে দর্শকদের মনজয় করাই বাংলা চলচ্চিত্রের প্রাপ্তি নয়, এই প্রাপ্তিটা আরো বড়। নির্বাক ও সবাক যুগে বাংলা চলচ্চিত্রে গুরুদেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ শুধু বাংলা সিনেমাকে গৌরবান্বিত করেনি, সেই সময়কার সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন তৎকালীন কলাকুশলীদের দিয়েছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। গিরিবালা দেখে অনেক প্রোথিতযশা বাঙালী বলেছিলেন — 'সিনেমার ভক্ত টক্ত নই মশাই, 'গিরিবালা' ছবিটা প্রথমত রবি ঠাকুরের গল্প,তার উপর অনেকে জোর করে দেখিয়ে আনল, তা মন্দ লাগেনি মশাই'। এর আগে কারুর সাথে চলচ্চিত্রের যোগাযোগ আছে জানলেই তৎকালীন বাঙালী ঘুনধরা সমাজ বলত 'শিক্ষাদীক্ষার কোন দামই রইল না। দেশটা দিন দিন রসাতলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে'। ছা-পোষা পোষ্ট-অফিসের কেরানীও গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে বলত 'বায়োস্কোপ-থিয়েটারের লোক কোনদিনই কোন সম্মান পাবে না। ঐ সব চরিত্রহীনদের জীবনের মূল্যই বা কি?' তাই শিশির ভাদুড়ী সেদিন প্রফেসারি ছেড়ে, নরেশ মিত্র যেদিন ওকালতি ছেড়ে এসে যোগ দিলেন সিনেমা-বায়োস্কোপের দলে তখন সবাই ভেবেছিলেন সুনাম, ইজ্জত, প্রতিপত্তি ছেড়ে মনুষ্যজীবনের অমূল্য সম্পদ চরিত্রটি খোয়াতে কেন তাঁরা বিপথে পা বাড়িয়েছেন? তৎক্ষণাৎ না হলেও ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের সাথে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠায় বাংলা ছায়াছবির প্রোথিতযশা পথপ্রদর্শকদের পিচ্ছিল কন্টকাবৃত পথ সুগম হয়েছিল ও তাঁদের হৃত গৌরব ফিরে এসেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ
আমার জীবন - মধু বসু
যখন নায়ক ছিলাম- ধীরাজ ভট্টাচার্য

শীর্ণ বাহুর অরণ্যে রবীন্দ্রনাথ

সুপ্রিয় ধর
ইংরাজি বিভাগ

তুমি কি কেবলই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য কবি?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবলই কি ছবি?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ ?
কাল বৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা,
বাদলের প্রবল প্লাবন
সবই শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গতি নিঃশেষ?

সব স্মৃতি বেঁচে থাকলে হয়তো তা সাধারণের পক্ষে সহনীয় হতো না। আমরা সারা বছরের প্রতিটি দিন তাঁকে কাছে পাই, তাঁর সাথে আড্ডা দিই, তর্ক করি, তাঁর গান শুনি, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িতার অন্ধ যুক্তি বিহীন আবেগ নিয়ে তাঁর গান শুনি, তাঁর কবিতা পড়ি, সাম্রাজ্যবাদী লোলুপ দৃষ্টির বিরুদ্ধে তাঁর গানে- কবিতায় প্রসন্ন আশ্রয় খুঁজে পাই; আমাদের কাছে এই মস্ত বড় মানুষটির জীবন ব্যাপী, বিরামহীন প্রবাহ ও তাঁর স্মৃতি যদি কখনো ফিকে হয়ে আসে তবে তা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। কৃতঘ্ন আমরা, তাঁর কাছে যে স্নেহ ও প্রশ্রয় আমরা পেয়ে চলেছি, সাম্প্রতিক পৃথিবীর মূল্যবোধহীনতার প্রেক্ষাপটে যে বিশ্বাসের শক্ত জমিতে তিনি আমাদের প্রতিনিয়ত দাঁড় করিয়ে দেন, তার মূল্যও আস্তে-আস্তে কমিয়ে বলতে শিখবো। কিন্তু যে পাপের মার্জন নেই তা যদি এমন হয় যে বর্তমান বিশ্বের 'অদ্ভুত আঁধারের' পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আপোষহীন, সর্তক, সক্রিয়, নিরন্তর সংগ্রামী ভূমিকাকে বিস্মৃত হই। সুখ-দুঃখে, ধ্বংসে-সৃষ্টিতে আমরা পরস্পরের আত্মার পরম আত্মীয়, আমরা সমান অংশীদার। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখী' কবিতার কয়েকটি পংক্তি সহায়কজ্ঞানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে

আমরা দুজনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও আত্মরতি
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি
ভ্রান্তি বিলাস সাজেনা দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি করে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি ঃ
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে
তোমাকে বন্ধু আমি লোকায়তে বাঁধি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছন্দে প্রবলভাবে আন্দোলিত, প্রবলভাবে উপস্থিত। সুখে, দুঃখে, হর্ষ-বিষাদে, চেতনায় রক্তক্ষরণের মুহূর্তেও রবীন্দ্রনাথের প্রবল উপস্থিতি। পৃথিবীর সব মহৎ কবির মতো রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনন্য লেখার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেন। আমাদের বড় হয়ে ওঠার ইতিহাসে, আঁধারে আলোকে, অমৃতের সন্ধানে আমাদের সুদীর্ঘ পথ যাত্রায় প্রথম পথিকপুরুষ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার ক্ষুদ্র শরীরে জগতের আনন্দ যজ্ঞে, অমৃতের তীর্থপথে মানবাত্মার পথচলার ইতিবৃত্ত দৃষ্টান্তিত হয়ে আছে।

রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোক বিন্দুটিরে ক্ষণে দেখি,
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ।
পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেই মতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে

দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে-
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।।

দেশ ও দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং সামগ্রিক অনগ্রসরতা এক মনীষীর মতো রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ঃ "এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।" তা না হলে—

মোদের কিছু নাইরে নাই, আমরা ঘরে বাইরে গাই—
তাইরে নাইরে না। না না না।
যতই দিবস যায় রে যায় গাইরে মুখে হায় রে হায়—
তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না।।
যারা সোনার চোরাবালির'পরে পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই — তাইরে নাইরে নাইরে না।
না না না।।

সেই মানুষটি, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, কখনো পথ হারান না। রূপসী মেঘের ছল তাঁকে পথ ভোলাতে পারেনা, বিপথে নিয়ে যেতে পারেনা। মেঘ, বৃষ্টি, আর ভ্রান্তির কুয়াশা পার হয়ে আজন্ম লালিত বিশ্বাসের স্থির বিন্দু মানুষের প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস। মানবসভ্যতার অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় যা কিছু শুভ, মঙ্গলময়, যা কিছু প্রফুল্ল আলোয় আলোকময়—তার জন্য রবীন্দ্রনাথের অবিরাম অন্বেষণ। মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি চেতনায় ভাস্বর হয়ে ওঠেন, এক ধরণের অপাপবিদ্ধ উৎসাহ আর অকৃপণ আবেগ তাঁকে প্রদীপ্ত করে। তাঁর সৃষ্টি মহীরূহের মতো আকাশের দিকে হাত স্থিত করলেও, শিকড়টি নিবিড়ভাবে মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত, মাটির গন্ধে তাঁর সৃষ্টি আকীর্ণ হয়ে আছে,

মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর আসক্তি স্থায়ী ও চিরন্তন।

"..... এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা— এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা — ডাকিয়া বলিতে হবে-
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে ,

.....

যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বৃহদংশে অনুরণিত অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ, কষ্টস্বীকার, নির্বাসন ও বন্দীজীবন, পৃথিবীর দেশে দেশে নানা বিভঙ্গের আন্দোলন-সংগ্রাম, কত বিদ্রোহ, কত বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, রাশি রাশি সাহস আর প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকার বীরত্বগাথা। হিমালয়স্পর্শী শপথে বলীয়ান হয়ে, কাল মার্কসের ভাষায় " শীর্ণবাহুর অরণ্যে", ভ্যানের হেডলাইটের ঝলসানো আলোর সামনে, রাত্রির অন্ধকারে উন্মত্ত বুটের শব্দ শুনতে শুনতে শেকল ছেঁড়ার নেশায় শীর্ণ হাত গুলো যখন মৃত্যুঞ্জয়ের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যায়, তখনই সৃষ্টি হয় মহাকাব্য। মানুষের এই মহাকাব্যিক ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের মননের ইতিহাস, ভাবনার বিশুদ্ধতম নির্যাস।

"যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।"

এই বোধ, উন্মত্ত তুফানের সামনে হাল ছেড়ে না দেওয়ার দৃপ্ত মানসিকতা, সহজ লোকের মতো সহজ পথে চলার, চরম আকালেও স্বপ্ন দেখার এবং স্বপ্ন দেখানোর নবীন আশা, সর্বোপরি মানব ধর্মকে মাথায় রেখে বিপদের সামনেও সোজা রাস্তায়

চলার অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেয় বিশ্বমানবতার বিস্তৃত, উদার প্রাঙ্গণে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে, সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ চেহারা প্রত্যক্ষ করে, ফ্যাসিস্ত অত্যাচারে নির্যাতিত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, ইউরোপের ফ্যাসিস্ত শক্তির প্রবল প্রতাপ-এর সামনে বিন্দুমাত্র থমকে না থেকে, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো এগিয়ে চলার আহ্বান, যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে দেশ মহাদেশ জুড়ে প্রবল সিংহনাদ, লক্ষকোটি মানুষের প্রকাণ্ড জীবননাট্যের পূর্ণ ইতিহাসের মূর্তি গড়ার অন্তহীন বাণী।

এই সময়েই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অশুচি ও অপমানিত চরিত্র স্পষ্ট হলো, মনুষ্য নিষ্পেষিত হতে লাগলো মানুষের দ্বারা। স্বৈরতন্ত্রের বাতুল বীভৎসতা, 'প্রবল প্রতাপশালীর ও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা' যে মুহূর্তের হাতের পুতুল, দীর্ঘ আশি বছরের বিরতিহীন জীবনে ও সাহিত্যে এই বিশ্বাস চেতনারূপে সদা সক্রিয় থেকেছে। মানবেতিহাসে অনেকসময় মনে হয় মধ্যাহ্নেই নেমে এলো রাত্রির নিঃসীম অন্ধকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন্ত্র 'চরৈবেতি-চরৈবেতি'— এগিয়ে চলো —এগিয়ে চলো। আর সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারেন "বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে/ পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে।"

অনৈক্যের চোরাবালিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোন্মাদনার মতই উগ্র ধর্মান্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের লড়াই,-সর্পিল,নির্লজ্জ এবং কুটিল এই শক্তিগুলো আধুনিকতার প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় প্রতিনিয়ত। যে রক্তহিম করা দানবীয় উল্লাস অন্ধ, বোবা প্রহরে বিবস্ত্র শরীরের দখল নেয়, স্তম্ভিত মুহূর্তে যখন ধ্বসে পড়ে সুরম্য প্রাসাদ, রক্তের নদীতে যখন ভেসে যায় ধুয়ে মুছে যায় নগরীর সারি সারি আলোকস্তম্ভ, ধর্মের বেদীমূলে হত্যা করা হয় যখন মানবতাকে, মানবতার উদার সমুন্নত মহিমাকে, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তখন প্রত্যয়ে স্থির, অবিচল, অগ্নিবর্ষী শব্দের বিস্ফোরণ।

হে ধর্মরাজ, ধর্মাবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে জাগাও আসি
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙ্গো-ভাঙ্গো আজি ভাঙ্গো তারে নিঃশেষে
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কোন জিনিসকেই পোশাকী করে রাখতে

চাননি। সমস্ত সুন্দর জিনিসকেই জীবনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন, অন্যদেরও সুন্দর কে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ, জীবনের ছন্দ হিসেবে সম্পৃক্ত করে নিতে বলেছেন। দুর্বিষহ লাগলেও মেনে নিতেই হয় আমাদের এই মহাকাব্যিক ভারতবর্ষ ধর্মান্ধতা আর অশিক্ষার প্রবল পরাক্রান্ত আক্রমণে শতধা বিভক্ত। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে নিত্য অনুভূত হয় যে মলিনতা,ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, অন্ধ ধর্মাচরণ থেকে উদ্ভূত বিচারবিহীন, অন্ধতা — এই সব অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রলেখনী সবর্দা সচেষ্ট ও সক্রিয় থেকেছে। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আশি বছরের যাত্রাপথের সূচনাপর্বে অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা আকীর্ণ হয়ে আছে। 'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 'এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিস — এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদনের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আকার ধারণ করেছে।' আবু সয়ীদ আয়ুব গীতাঞ্জলি-গীতমালা গীতালিকে ঈশ্বর-প্রেম সম্বন্ধীয় কবিতা বা গান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যদিও আয়ুব একথা জানাতে বিস্মৃত হননি যে দর্শন ও ধর্মচিন্তার পথ পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-বিশ্বাস ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে, ভাববাদের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রবিষ্ট হয়েছেন বস্তুবিজ্ঞানের অন্তর্লোকে। ইংরেজি গীতাঞ্জলির "Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire!"—সর্বপ্লাবী এই উজ্জ্বল আনন্দের স্রোতে একাকার হয়ে আছে প্রকৃতি ও মানবজীবন, স্বদেশচিন্তা এবং সর্বোপরি ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মানবতার জয়গান।

'গোরা' উপন্যাসে গোরা খুঁজে বেড়িয়েছে ভারতবর্ষকে। জটিল, সুদীর্ঘ ভারতসন্ধানের শেষে পরেশ বাবুর কাছে ফিরে এসে গোরা বললো— "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই- যার মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে, কোনদিন অবরুদ্ধ হয়না— যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার মধ্যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাড়াবাড়ি নেই। রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানবতাবাদের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কখনোই বাধা পড়েননি। 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহ ধর্মের বেদীমূলে প্রাণদান করে গেলো। দয়াময়ী জগন্মাতা রাজরক্ত না পেলে তৃপ্ত হবেন না রঘুপতির এই কথা বিশ্বাস করতে পারেনি সে, অথচ রঘুপতির আদেশ কে লঙ্ঘন করার সাহস এবং ঔদ্ধত্য কোনোটাই সে অর্জন করে উঠতে পারেনি।

মৃত্যুকালে তার অন্তরের উপলব্ধ সত্য উচ্চারিত হয়েছে নিম্নোক্ত পংক্তি গুলোতে

রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত বহে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।

'আমাদের শিল্পকলা' প্রবন্ধে একজায়গায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন ঃ আগেও ছিল, এখনো আছে, একশ্রেণীর লোক, জাতের কর্তা হয়ে ওঠে তারা, যার জাত নেই জাত দিতে জানেনা, যে জাত ঘুমোচ্ছে তাকে জাগাতে হলে কি করা উচিত তাও জানেনা, জাত মারবার ফন্দিই তাদের মাথায় ঘোরে, পাশাঙ্কুশ—হস্তে তারা যমরাজের মতো বসে থাকে জাতকে বাঁধবার পাশ আর জাতকে মারবার অঙ্কুশ দুই অস্ত্র সর্বদা উঁচিয়ে।

আগেও ছিলেন এখনো আছেন অন্য এক শ্রেণীর লোক যাঁরা বরাভয় হস্তে বুদ্ধদেবের মতো দ্বারে দ্বারে হেঁটে বেড়ান, সমস্ত মানবজাতির হাতে ভিক্ষা নিয়ে তাঁরা জগৎবাসীকে ধন্য করে' যান, অভয় দিয়ে নির্ভর করেন, বর দিয়ে শক্তিমান করেন। সুপ্ত জাতির মুমূর্ষু জাতির আশার প্রদীপের শিখা এই সব জাগ্রত মানব-আত্মা, যাঁরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো বহন করে আনেন।"

এই একই মানবতাবাদী দৃষ্টি Sophocles -এর Antigone নাটকে কোরাস -এর সংলাপের ধ্বনিত হয়েছে — "Wonders are many on earth and the greatest of them is Man." রবীন্দ্রনাথ এই মানব-আত্মাকে জাত-পাতের উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন, সক্রিয় থেকেছেন। এখানে অবশ্যই স্মর্তব্য রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের সেই অবিস্মরণীয় অংশটি যেখানে রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যজ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, মহানুভবতা, নিবিড় আত্মীয়তার আন্তরিক প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করে, পুলকিত হয়ে স্মরণ করি কবি অমিয় চক্রবর্ত্তীর অত্যাশ্চর্য কবিতা 'বিনিময়'-এর পংক্তিটি — "এ-ও কি রেখে গেলো।" রবীন্দ্রনাথ কতকিছু মণিমাণিক্য যে রেখে গেলেন তাঁর

দীর্ঘ আশি বছরের বিরতিহীন সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে তার হিসেব মেলাতে গেলে আমাদের মনের অবস্থা ঠিক সেই রকম হতে পারে- "যদিও ভিন্ন অর্থে —যে দশা হয়েছিলো অর্জুনের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের যবনিকা, যখন উঠেছিলো"— এবং বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন অর্জুন কাতারে কাতারে শত্রুবাহিনী দেখতে পেয়ে ।

আমরা জ্ঞানলাভের পর থেকেই শুনে আসছি, সুপ্রাচীন কাল থেকে শুনে আসছি ঈশ্বরের করুণা লাভ করতে গেলে সাধকের অনেক গুণ থাকতে হবে, অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অনেক তপস্যা করতে হবে। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক এই অখ্যাত চণ্ডালকন্যাই কি প্রথম আমাদের মনে করিয়ে দিলো যে ব্যাপারটা একতরফা হলে চলবেনা ; ঈশ্বরের কিছু সৎ এবং মহৎ গুণ থাকা অত্যাশক, আমাদের পূজা লাভ করতে হ'লে তাঁকেও সম্যকরূপে পূজনীয় হতে হবে। রাজার বিধানে যদি অত্যাচার ঘটে তবে আমরা ঈশ্বর ভক্ত হবো কেমন করে? .....পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ যদি দুঃখে যন্ত্রণায় অবমাননায় চোখের জল ফেলতে থাকে তবে সে-হাহাকারের মধ্যে কি পূজা অন্তর থেকে স্বতঃই উৎসারিত হতে পারে? আমাদের উপাস্য দেবতা কি শুধু শক্তিরই দেবতা, তিনি কি মঙ্গলের দেবতা নন? যদি মঙ্গলের দেবতা হন তবে তাঁর 'চণ্ডালিকা'-রচয়িতার মনেও কি সেই প্রশ্ন জাগেনি তাঁর জীবনের শেষ দশকে যখন ঐ-নাটকটি লেখা হয়?"

ইংরেজ কবি য়েটসের মতো রবীন্দ্রনাথও ধর্মসমাজ ধর্মের সীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং লালিত পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মের এই চৌহদ্দী থেকে যৌবন শেষ না হতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্ব-নিরীক্ষায় বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রয়োগ রবীন্দ্রমননকে মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত হৃদয়ের প্রশস্ত পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করেছিলো। য়েট্স নিজের সমাধিফলকের জন্য যে সংক্ষিপ্ত এপিটাফ রচনা করেছিলেন—

Cast a cold eye
On life , on death.
Horse man, pass by!

বুঝতে অসুবিধে হয়না যে য়েট্স জগৎ, মানুষের জীবনধারা, জগৎ প্রবাহ কে ঠিক মেনে নিতে পারেননি। বহু কবিতায় য়েট্স- এর এই স্টোইক মানসিকতা বিস্তারিত হয়ে আছে। কিন্তু মধ্যপথে মুখস্থ ভূমিকা প্রায়শই ভুলে গিয়ে মঞ্চ থেকে অন্তরালে সরে যাওয়া পরাজিত করুণ নায়ক নন্ রবীন্দ্রনাথ। মানবতার সমুন্নত মূল্য বোধ গুলিকে

বয়সের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে, মৃত্যুভয়কে পরাজিত করে নিজস্ব জীবনে ও রচনায় লালন করে গেছেন পরম যত্নে ও মমতায়। প্রতিকূল সময়েও অনুকূল বাতাসের কুশল সংলাপ করে গেছেন। সমস্ত রকম আবিলতাকে প্রতিরোধ করতে তাঁর ভূমিকা ছিল উদ্দালকের মতো। অন্ধকার অবসিত হোক। আলোর অভিমুখে হোক আমাদের যাত্রা নীলিমায় লিপ্ত হয়ে থাকুক মুক্তির মেঘমালা। দিগন্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক শান্তির মহামন্ত্র। নিরভিক্ষাণ কুয়াশার মধ্যে নিরন্তর চলুক মানুষের বেঁচে থাকার সমাজ ও জীবনের স্বাস্থ্যরক্ষার নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, অবিরাম অর্থপূর্ণ আমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানুষের ধর্ম

জয়িতা দত্ত
দর্শন বিভাগ

Religion এই ইংরাজী শব্দটিকে সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম বলা হয়। বুৎপত্তিগতভাবে যার মানে বোঝায় যা দৃঢ়ভাবে আমাদিগকে ধরে রাখে। ব্যাকরণগত ভাবে এর অর্থ হল কোন বস্তুর গুণ বা কোন বস্তুর সন্তাস্থিত গুণ। তথাকথিত বা প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার সাথে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝে তা হলে পৌত্তলিকতা, পূজা- অর্চনা, হোম, যজ্ঞ ইত্যাদি এবং একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। কিছু কিছু মানুষ কিছু নির্দিষ্ট দেবতাকে পূজা করে এবং যারা তা করেনা তাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে একটা ধর্মগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিজের ধর্মের মানুষকে তারা প্রাধান্য দেয় এবং অন্য ধর্মের মানুষের থেকে দুরত্ব বজায় রাখে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্ম এই ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়না, তাঁর কাছে ধর্ম হল এমন যা মনকে প্রসারিত করে, সেখানে সংকোচের কোন স্থান নেই। প্রভাতের আলোকে দেখার জন্য যেমন কোন কৌশলের প্রয়োজন নেই ঠিক তেমনি ধর্মকে গ্রহণের জন্য কোন কৌশলের প্রয়োজন নেই। ধর্মকে পাওয়ার জন্য যদি কোন আয়োজন করা হয় তাহলে ধর্মকে আর পাওয়া হয়না। যে গ্রন্থ যত জটিল তার মধ্যে মানুষ তত বেশী জ্ঞান আছে বলে মনে করে, তাই ধর্মকে সহজ ভাবে না পেয়ে মন্ত্র,তন্ত্র যাগ যজ্ঞের মাধ্যমে পাওয়ার চেষ্টা করে। মানুষ তার প্রয়োজনীয় অন্যান্য পাঁচটা দ্রব্যের মতো ধর্মকে নিজের অনুগত করে রাখতে চায়, কিন্তু ধর্মকে সংসারের অন্যান্য দ্রব্যের মতো নিজের অনুগত করে রাখতে চাইলে ধর্ম তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে ফেলবে।

বিভিন্ন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন দেব পূজা করে তাদের মূল উদ্দেশ্য হল মনের শক্তি অর্জন করা। কবি মনে করেন এই শক্তি নিহিত আছে এক অদ্বিতীয়ম ব্রহ্মে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক নিত্য, একে পাওয়ার জন্য কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই তা প্রভাতের আলোর মতোই আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। অন্তরের মধ্যে ব্রহ্ম চেতনার উদ্ভব হলে পাপ পুণ্যের কোন জায়গাই আর থাকেনা। আমাদের অন্তরে আছে ধর্মবোধ তাকে আলদা করে খুঁজতে যেতে হয়না।

রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ধর্মপ্রচারকে গুরুত্ব দিতেন না তিনি মনে করেন প্রাচীন

ধর্মগুরুগণ কোন নতুন সত্য আবিষ্কার করেন এমন নয়, যা আছে তাকেই নতুন করে প্রচারের চেষ্টা করেন। আমরা তাঁদের বাণী গুলি অনুশীলনের মাধ্যমে বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করে ফেলি এবং ধর্মকে একটি সম্প্রদায়ের অধিকারে পরিণত করে আবদ্ধ করে ফেলতে চাই, কিন্তু ধর্মকে যারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করে প্রচার করতে চেষ্টা করে তারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হতে দূরে ঠেলে দেয়। ধর্মকে তারা একটি বিশেষ দিনের, বিশেষ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে এবং কোন কিছু নিয়মের এদিক ওদিক হলে হুলুস্থুল পড়ে যায় অথচ সংসারে একমাত্র যা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যা মিলনের সেতু তাকেই বলা হয় ধর্ম। ধর্ম মনুষ্যত্বের কোন একটি অংশে থেকে অন্য অংশের সাথে কলহ করেনা, তার সমগ্র মনুষ্যত্বে থেকে তাকে পরিপূর্ণ করে। রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের ধর্ম Religion নয় তা কোন একটি অংশে সীমাবদ্ধ নয় সমগ্র অংশেই তার ব্যাপ্তি। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্য নয় সমগ্র সংসারই ধর্ম-সাধনের জন্য। মানুষই পারে তার নিজের মধ্যে ধর্মকে উপলব্ধি করতে, মানবাত্মার মধ্যে বিশ্বাত্মার আর্বিভাব, তাকে উপলব্ধি করতে পারলেই মনুষ্য হৃদয়ে আসবে পরিতৃপ্তি এবং কোন ভেদাভেদ ও ভুলবোঝাবুঝিও থাকবেনা।

কিন্তু সাধারণ মানুষ ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করে, ধর্মপ্রচারে ধর্মধ্বজা নিয়ে বের হয় এবং অন্যান্যদের সাথে তুলনা করে নিজেদের মন্দির সংখ্যা গুনতে উদ্যত হয়। এর ফলে প্রকৃত ধর্ম যা ব্রহ্মে বিরাজমান এবং যার বাসস্থান মানুষের মধ্যেই তার আস্বাদ আর পাওয়া হয়ে ওঠেনা।

কবির মননে মানুষ কিন্তু কখনই কোন নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকতে চায়না, স্থান, কাল ও দৈহিক সীমার ভেদ পার করে সে চায় সকলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে, এর মধ্যে দিয়ে তার যে সত্তাটি প্রকাশিত হয় তা এক প্রকৃত মানবের, এর জন্য তাকে আপন আত্মাকে অন্যের মধ্যে এবং অন্যের আত্মাকে নিজের মাঝে প্রত্যক্ষ করতে হয়। তাই মানুষের উচিত এমন ধর্মের অনুশীলন করা যা তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনাকে পরম মানবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

মানুষের মনের আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটলে ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে আর কোন ভেদাভেদ থাকে না। যদিও মানুষের ইতিহাস শুরু হয়েছে কতকগুলি জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য কিন্তু তার মধ্যে এক 'সুপ্রিম ম্যান' বা পরম মানবের অস্তিত্ব সবসময়ই বর্তমান ছিল। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ তার মধ্যে এই পরম মানবের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। তার ফলে সে এমন কাজ মাঝে মাঝে করে ফেলে যার ফলে

তার এই পরম মানব সত্তা প্রকাশিত হতে পারে না।

কবি বলেন তাই সর্ব প্রথম প্রয়োজন চেতনার বিকাশের। কারণ চেতনার ক্রমবিকাশের মাধ্যমেই মানুষ সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে দূরে সরিয়ে রেখে পরম মানবসত্তাকে প্রকাশিত করার লক্ষ্যে ব্রতী হতে পারবে, এটিই প্রকৃত মানব সত্য।

মানুষের ধর্মের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সদাচারিতার কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। গ্রাম থেকে শহরে ফেরার পথে যান্ত্রিক গোলযোগে পড়া কবিগুরুর গাড়িতে গ্রামের মানুষেরা প্রবল জলকষ্ট সত্ত্বেও জলসরবরাহ করেছিল, বিনিময়ে তারা কোন মূল্য দাবী করেনি। অন্যদিকে শহরতলীর কাছাকাছি জায়গায় যেখানে অপেক্ষাকৃত জলকষ্ট কম সেখানকার মানুষের মধ্যে এই সদাচারিতা আমরা দেখতে পাইনা। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সদাচারিতা মনুষ্যজীবনের দীর্ঘ অনুশীলনের ফল, ধর্মকে মানুষ যখন নিজের জীবনের অঙ্গীভূত করে তখন তার ভিতর থেকেই আসে এই সদাচারিতা।

চৈনিক সন্ন্যাসী লাওৎসে একজন সত্যিকারের ভাল মানুষ তাকেই বলেন যিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন, কিন্তু কোন কিছুর দখল নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। উপরোক্ত জলদানের ঘটনাটি হয়তো খুবই সাধারণ একটি ঘটনা বলে মনে হতে পারে কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে মানব জীবনের পরম সত্তার একটি চরম প্রতিফলন। কিভাবে কোন জিনিস ধ্বংস করতে হবে তা কাউকে শেখাতে হয়না কিন্তু শত্রু জেনেও সাহায্য করা বা পথচারীকে সাহায্য করার এই মনোভাব তাদের বংশপারম্পরিক অনুশীলিত সদাচারের মধ্যে দিয়ে সরলতায় যে গভীরভাব ব্যক্ত হয় তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক উৎকৃষ্ট সম্পদ। শহরতলীর নিকটবর্তী যে মানুষেরা জলের বিনিময়ে অর্থের প্রত্যাশা করেছিল তা থেকে বোঝা যায় যে এদের ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক সংহতি লোপ পেয়েছে। লাভ ক্ষতির হিসেব পরিমাপ করতে গিয়ে এইসব মানুষেরা সৌন্দর্য ও সদাচারের পথ থেকে সরে এসেছে। এর ফলে তাদের অন্তরের বিশ্বজনীন সত্তার প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে অপূর্ণ।

অথর্ববেদে উল্লেখিত একটি প্রশ্ন হল—'তিনি কে যিনি মানুষকে উপহার দিয়েছেন তার সংগীত ?' বনের পাখিরা বিশেষ বিশেষ স্বরে গান শুনিয়ে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে সুরের স্রষ্টা সে নিজে, ব্যক্তিমানুষ যখন নিজেকে পূর্ণতম রূপে প্রকাশ করতে আগ্রহী হয় তখন সে সুর, ছন্দ ও কথার মেলবন্ধনে সৃষ্ট সংগীতকেই মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয় । মানুষ তার আচরণ, সঙ্গীত, শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে যে পরিপূর্ণ সত্তার প্রকাশ করতে চায় তা তার আভ্যন্তরীণ পরমসত্তা।

জাপান ভ্রমনকালে রবীন্দ্রনাথ জাপানবাসীদের মধ্যে অবিনাশী মানবধর্ম অনুশীলনের ঐতিহ্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু সাথে সাথে এর এক বিপরীত চিত্রও প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা হল কারিগরী দক্ষতায় বস্তু সম্পদের প্রাচুর্য ও মারণাস্ত্রের সম্ভার। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে বস্তুসম্পদের প্রাচুর্যজনিত সভ্যতা যতই বিপর্যয় ডেকে আনুক না কেন অবিনাশী মানবধর্মের অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই জাপানবাসীরা মানবসভ্যতার ইতিহাসে গৌরবজনক অধ্যায় রচনা করবে।

লাওৎসে বলেছেন, জীবনের শাশ্বত মূল্য না জানলে প্রকৃতিগত চাহিদাগুলো বড় হয়ে ওঠে। একে আমরা বলতে পারি এক ধরণের পাপ। তিনি আরও বলেছেন "তোমাদের এমন কর্ম করতে হবে যার ফলে আমাদের মৃত্যু হলেও বিনাশ না হয়" তাঁর মতে মৃত্যু হলেও আমাদের দৈহিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে কিন্তু মনুষ্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে আমরা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাই। এক অবিনাশী মানবসত্তার প্রেরণায় কর্ম করাই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছেন আমরা যেন সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে বস্তু সম্পদের প্রাচুর্যকে অতিরিক্ত মূল্য না দিই। তিনি আমাদের বুদ্ধদেবের বাণীগুলি অনুসরণের কথা বলেন- বুদ্ধদেবের যে বাণীগুলি মানুষকে নিজের উৎকর্ষ বিকাশে সাহায্য করেছে তাই হল সর্বকালীন মানবধর্ম। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মানুষ সসীমতার গন্ডী পেরিয়ে অসীমতায় পাড়ি দেয়।

কবি মনে করেন জীবনের সার্থকতা প্রসারতায়। একটি পাইনগাছ তার বিপুল আকৃতি সত্ত্বেও সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য যেমন আকারগত অতিশয্য দোষে দুষ্ট হয়না তেমনি নিজের অন্তর্গত মানবসত্তাকে উপলব্ধি করে বিশ্বমানবে পৌছানোর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হবেনা। আর এই সসীমের মধ্যে থেকে অসীমে পৌছানোর প্রচেষ্টাই হল প্রকৃত মানুষের ধর্ম।

ধর্মের অনুসন্ধান মানুষ করবে নিজ অন্তরে। নিজের বিকাশের মাধ্যমে সে অপর সত্তারও বিকাশ ঘটাবে, তাই আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছেন।

'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ'।.....

একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সবঠাই।

আপন মনের মধ্যেই আমরা পাব প্রকৃত মানব এর পরিচয়, উপনিষদে বলা হয়—

যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। উপনিষদের ঋষি বলেছেন ঃ তৎ বেদাং পুরুষং বেদ। যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানতে হবে। অন্তরের আপন বেদনায় যাঁকে

জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানতে হবে, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই ধর্মকে পাওয়ার জন্য কোন বিশেষ কর্ম বা আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। মানব ধর্মের প্রকাশ ঘটে তার প্রত্যহের কর্মে, সেখানেই সে বিশ্বাভিমুখী সেখানেই সে পারে তার জীবভাবের মধ্য দিয়ে প্রকৃত বিশ্বভাব প্রকৃত মানব ধর্মের প্রকাশ ঘটাতে। রবীন্দ্রনাথের মানব ধর্ম আলোচনায় আমরা যেন নিজেদেরকে নতুন করে খুঁজে পাই, এতে পাই এক মিঠে সতেজ হওয়া ও বাংলার মাটির গন্ধ। সেখানে কোন ভেদাভেদ নেই। সকলেরই সেখানে প্রবেশের অপার অনুমতি। প্রত্যেকের নিজের মধ্যে যা আছে তারই প্রকাশ হল প্রকৃত মানব ধর্ম, তাকে আর নতুন করে খুঁজতে যেতে হয় না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ক্ষিতিমোহনের সেনের অমূল্য সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত এক বাউলের বাণী :

" জীবে জীবে চাইয়া দেখি
সবই যে তার অবতার
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি,
যার নিত্যলীলা চমৎকার।"

-ঃ তথ্যপঞ্জী ঃ-

১. ধর্ম — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলকাতা
শ্রাবণ ১৪১৬

২. মানুষের ধর্ম— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, কার্তিক, ১৪১০

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান
(মূল হিবার্ট বক্তৃতামালা থেকে নির্বাচিত
অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ)— অনুবাদক শংকর সেনগুপ্ত
মুদ্রণ ঃ আগষ্ট, ২০০৮

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনার আলোকে সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা

ডঃ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য্য
প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও দার্শনিক, আবার তিনি হচ্ছেন একজন চিন্তানায়ক তাই তিনি সহজেই আলাপ আলোচনা করে গিয়েছেন সমসাময়িক বিশ্বের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির সঙ্গে। এমনকি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গেও আলোচনায় তাঁর কোন অসুবিধা ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনে বিজ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যদিও তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের হরেক রকম বিজ্ঞানচর্চার ধরণ অনুধাবন করলে বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক ইতিবাচক দিক গুলি বুঝতে পারা যায়। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' নামক রচনা এবং 'বিশ্বপরিচয়' নামক গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তাঁর ছোটবেলা থেকেই। এইসময় বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে ও তার ফলাফল ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে কার্যকারণ সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর মন চমৎকৃত হয়েছিল। তিনি যখন প্রায় বারো বছর বয়সে তাঁর পিতার সঙ্গে ডালহৌসি পাহাড়ে বেড়াতে যান, তখন সেখানে পিতার কাছে থেকে রাতের আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র চিনেছিলেন ও সেগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য শুনেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে বহু দূরের জ্যোতিষ্কগুলি সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে জেনে তিনি জ্যোর্তিবিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর পিতা যা বলেছিলেন, সেই গুলো নিয়ে তিনি একটি বড় প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর তা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।' বস্তুত ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড তাঁর মনকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে লিখেছেন যে, বিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান বিষয়ক সহজবোধ্য গ্রন্থাদি পাঠ করে তাঁর মনের মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ' গড়ে উঠেছিল, অর্থাৎ যে কোন তত্ত্ব বা ধ্যান-ধারণাকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণ করে তাকে গ্রহণ বা বর্জন করবার প্রবণতা জন্মেছিল।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন কোন্ কোন্ সত্য বা সত্যের সঠিক রূপ বিজ্ঞান নির্ণয় করতে পারবে, তা সার্বিক ভাবে মানুষের

জানবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যে সত্য বা সত্যের সঠিক রূপ মানুষের জানবার ক্ষমতার বাইরে, মানুষের বিজ্ঞানের কাছে তার অস্তিত্ব নিরর্থক এবং সেদিক থেকে বিজ্ঞান খানিকটা সীমাবদ্ধ। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে জার্মানিতে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর কাপুথের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের যে কথোপকথন হয়েছিল, তাইতে 'মানুষের ধর্ম' তথা মানুষের প্রকৃতির প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। (এই কথোপকথনের বঙ্গানুবাদ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ 'সত্যের স্বরূপ' নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন)। ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় রবীন্দ্রনাথের অভিমত বেশ কিছুটা সমর্থিত হয়েছে। শুধুমাত্র তাই নয়, সম্প্রতি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি খ্যাতনামা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী লর্ড রীস সমান্তরাল ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব, শূন্য স্থানের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম গঠন প্রভৃতি কয়েকটি জটিল প্রাকৃতিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, সেগুলো জানা বা বোঝা মানুষের বুদ্ধির ক্ষমতার বাইরে এবং সেজন্য বিজ্ঞান কখনোই সেগুলোতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। ছেলেবেলায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখা শুরু, আবার সত্তর বছর পার করে পরিণত বয়সে পরিকল্পিত ভাবে রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন 'বিশ্বপরিচয়'। বস্তুত বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ রচনার পিছনে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য হল লোকশিক্ষা। এছাড়া আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হল ঃ "আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্য-রসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন, তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।" বস্তুত 'বিশ্বপরিচয়' রচনার নেপথ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উদ্দেশ্য। এবং বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্য থেকেই মনীষী রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মনস্কতা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা, সাহিত্য আসর থেকে ছুটি নিয়ে তাঁকে বিজ্ঞানের শুধু অঙ্গিনা নয়, একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে অনু-পরমানুর অন্দরমহলের খবর জানতে হয়েছিল, মহাকাশের শত শত আলোকবর্ষ দূরের জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে হয়েছিল। তবেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল 'বিশ্বপরিচয়' লেখা।

রবীন্দ্রনাথের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যুগটা বিজ্ঞানের। বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতিতে দেশের অগ্রগতি সম্ভব। পরাধীন দেশকে স্বনির্ভর হতে হলে বিজ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। দেশবাসীকে বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে বিজ্ঞানকে সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন অতি জরুরী। এটি বুঝেই তিনি এদেশের তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর হাতে উৎসর্গ করেছিলেন বইটি। আবেদন জানিয়েছিলেন দেশের সাহিত্যিক, লেখক ও বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতুহলী রবীন্দ্রনাথ যখন জানলেন,প্রায় সমবয়সী একজন তরুণ বাঙালী বিজ্ঞানী বিলেত থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন, তিনি নিজেই

ছুটে গেলেন তাঁর বাড়ি তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ১২৯৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ ফনোগ্রাফ যন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গাওয়া ব্রহ্ম-সঙ্গীত একবার রেকর্ড করেছিলেন। যদিও দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গাঢ় হতে থাকে ১৮৯৭ খ্রিঃ থেকে। সাহিত্যকর্ম ও কবিতা লেখার ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ যে একসময় রেশম চাষে মন দিয়েছিলেন, একথা জানা যায় দু'জনের লেখা চিঠিপত্র আদান প্রদান থেকে। জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছেন (১০ আষাঢ়,১৩০৬) " শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার ও আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি।"রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল কৃষি বিজ্ঞানের দিকে নজর দিয়েছিলেন এবং কৃষি নিয়ে নানা গবেষণা চালিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রকে বিলেতে থেকে গবেষণার জন্য অনুরোধ জানাতে দেশপ্রেমী জগদীশচন্দ্র বন্ধু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মতো এদেশে একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। তাঁর সেই স্বপ্নই সার্থক হয়েছিল বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। জগদীশচন্দ্রের এই বিজ্ঞান গবেষণা মন্দির নির্মানে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বড় অংকের অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। "It was Rabindranath Tagore who collected Rs.200000 /- to construct a research laboratory for J.C.Bose so that he could continue his research work independently." এছাড়া জগদীশচন্দ্রকে দেশবাসীর কাছে পরিচিত করাতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাঁর আবিষ্কার নিয়ে। ছোট ছোট দুটি ঘটনার উদ্ধৃতি করে আমরা দেখতে পাই কবি ও বিজ্ঞানীর মধ্যে প্রীতির বন্ধন কত গভীর। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর খুবই শরীর খারাপ। নানারকম চিকিৎসা চলছে। তবু যেন শরীর ভালো হতে চাইছেনা। অবশেষে মৃণালিনী দেবী মারা যান। এই ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ তিন দিন বাড়ি থেকে বাইরে যাননি। চতুর্থ দিনে তিনি জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে যান। এতেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কতখানি জগদীশচন্দ্রের স্নেহ, প্রীতি ও সান্ত্বনার দরদীদার, দুজনের মধ্যে অন্তরের সান্নিধ্য কত। এটি একটি ছোট ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনাটি থেকে বুঝতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে ছিল কত প্রীতির সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এই বন্ধুত্বের সময়সীমা ছিল চল্লিশ বছর। ১৮৯৭-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের সুখে দুঃখে দুজনেই দুজনের বন্ধু। সময়ের তালে এইটি আরো দৃঢ়তর হয়। অন্যভাবে বলা চলে যে জগদীশচন্দ্র ছিলেন একজন রবীন্দ্র অনুরাগী। কবির সঙ্গীত, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্র, শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ড, জাতীয়তাবোধ সবই তাঁর বিরাট প্রতিভার প্রতিফলন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আরেক বিজ্ঞানী ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। দু'জনেরই জন্ম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। একজনের ৯ই মে, অন্যর ২রা আগষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সে হিসাবে তিন মাসের বড়। একজন কবি আর একজন রাসায়নিক। কবির যেমন রয়েছে বিজ্ঞান প্রীতি,তেমনি রাসায়নিকেরও সাহিত্যানুরাগ। জগদীশ-রবীন্দ্রনাথ সখ্য প্রফুল্ল-রবীন্দ্রনাথে দেখা যায় না। তবে তাঁদের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধায় ভরা।প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম বিষয়েও উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের গভীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁদের পরিচয় প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক লেখায় প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথ কবি। আমি রাসায়নিক হইলেও অরসিক। আমার সহিত পরিচয় তাঁহার রসলোকের নয় তাঁহার ব্যক্তিত্বের। রবীন্দ্রনাথকে মানুষ হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁহার লেখা পড়িয়া আনন্দে অভিভূত হই। সমালোচক আমি নই, সে স্পর্ধাও নাই, তথাপি এই কবির প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা আজ হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। মনে হয় বাংলাদেশের যে কি সম্পদ রবীন্দ্রনাথ তাহা বিদেশী কেহ বুঝিবেন না। কৈশোর হইতে আজ পর্যন্ত, এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলার আসরে কাব্যগান গাহিতেছেন। বাংলার পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, এমনকি সুদূর নিভৃত পল্লীর ঘরে প্রাঙ্গনে তাঁহার গানের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। বাংলার চাষার ছেলে মেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের গান গায়। তাহাদের অধিকাংশই কবির নাম পর্যন্ত শুনে নাই, তাহারা জানে না এ গান কাহার লেখা, কি ইহার সুর কিই বা ইহার তাল মান, কিন্তু তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে সে গান অতি সহজে আপনা আপনি ধ্বনিয়া উঠে। আনন্দের আবেগ আসিলেই তাহারা রবীন্দ্রনাথের গান ধরে। রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতি কবিতা বাঙালীর প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বাংলার ভাবধারাকে এক নতুন রসে কোমল করিয়া সমাজের চর্তুদিকেই এক নতুন সৌন্দর্য আনিয়া দিয়াছে। বাংলার নাড়ীর স্পন্দনে তাহার সুর তাল শোনা যায়। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া বাংলা দেশের কথা কল্পনাও করিতে পারি না।" এই হোলো রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের এক অকৃত্রিম স্তুতি উচ্চারণ।

আবার রবীন্দ্রনাথও প্রফুল্লচন্দ্রের সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে পড়েছিলেন যে অভিনন্দন বার্তা তাও গভীর শ্রদ্ধায় পূজামন্ত্রের মত। রবীন্দ্রনাথ পড়লেন — " আমরা দু'জনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন। আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি। নিজেকে দিয়েছেন, সে দানের

প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। বাস্তব জগতের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচার শক্তি বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়ার প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলেও এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনও সম্ভবপর হোত না। এই যে আত্মদান মূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবশক্তি, আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবেনা। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায় জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে পাথর দিয়ে নয় প্রেম দিয়ে"।

আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি। তবে তাঁদের মতবিরোধ ছিল। বিরোধ ছিল 'চরকা' কে কেন্দ্র করে। স্বরাজের সঙ্গে চরকার সংযোগ মেনে নিতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ অথচ মহাত্মা গান্ধীর চরকা ভাবনায় সায় যুগিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় তাই গান্ধী লিখেছিলেন — " Dr. P.C Roy's Frank recognition of the Charka is a Valuable acquisition."। তবে এই চরকাকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ আর প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই মনে হয়। কারণ ঠিক ঐ সময়েই আলফ্রেড থিয়েটারে বক্তৃতা দিয়ে পাওয়া পাঁচশত টাকা রবীন্দ্রনাথ দান করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের খুলনা দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিলে।

তথ্যসূত্র ঃ
১. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথঠাকুর
২. বিশ্বপরিচয়।
৩. রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স

বিপ্লবী লীলা রায়ের স্মৃতি চারণায় রবীন্দ্রনাথ

ডঃ জয়শ্রী সরকার
ইতিহাস বিভাগ

"বিজয়িনী নাই তব ভয়
দুঃখে ও বাধার তব জয়/
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়।।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩০ ফাল্গুন, ১৩৩৮

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামকরণ ধন্য "জয়শ্রী" পত্রিকা। প্রথম প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৩৮। পত্রিকার সম্পাদিকা বিপ্লবী লীলা রায়ের স্মৃতি চারণায় "মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়ে জয়শ্রী আত্মপ্রকাশ করল।" প্রকৃতপক্ষে, সেদিন নারীর বন্ধনমুক্তির সংগ্রামকে জাতীয় স্তরে বৃহত্তর বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণতি দেওয়ার জন্যই "জয়শ্রী" যেন অনিবার্য একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের নামকরণের সঙ্গে জয়শ্রীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সুরটি যেন আশ্চর্যভাবে মিলে গেল।

ব্রিটিশ সরকারের রোষানল এর ফলে জয়শ্রীর প্রকাশনা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ ছয়বছর কারাবাসের পর ১৯৩৮ এ লীলা রায়ের মুক্তির পর "জয়শ্রী"-র দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রকাশনার শুরু। তখনও পেলেন কবির আশীর্বাদ।

শুভেচ্ছা
মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টক পথ অকুণ্ঠপদে মাড়াও,
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি
রূদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর,
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর,
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।।"

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

লীলার মুক্তি যেন কবিকে নিশ্চিন্ত করেছিল। কারার অন্তরালে যে ক্লেদাক্ত জীবনের পরিচয় লীলার হয়েছে তার থেকে লীলার উত্তরণ নিশ্চয় হবে এই আশীর্বাদ কবি করলেন " কারাবাস থেকে নিষ্কৃতির অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছো.....মানুষের হিংস্র বর্বরতার অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছো — আশাকরি এর একটা মূল্য আছে। এতে তোমার কল্যাণ সাধনাকে আরো বেশী বল দেবে ..... পশু শক্তির উর্দ্ধে জয়ী হোক তোমার আত্মার শক্তি।" শুধু এই নয়, রবীন্দ্রনাথ প্রয়াণের প্রাক্কাল অবধি তাঁর বহু রচনা সমৃদ্ধ করেছে জয়শ্রী পত্রিকাকে। রবীন্দ্রনাথের লীলা এবং তাঁর জয়শ্রী পত্রিকা কোথায় যেন একটা অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। লীলাও তাই অকুণ্ঠভাবেই সেই সম্পর্ক স্বীকার করেছেন, "আমরা রবীন্দ্রযুগ জাতই শুধু নই; তাতেই বিধৃত, আলো বাতাসের মতই আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছি রবীন্দ্র আকাশে আমাদের মনন ও মানসিকতা, আচার আচরণ, বিকাশের বিচিত্র উপকরণ ..... বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী।"

লীলা নাগের জন্ম ২রা অক্টোবর ১৯০০ তে এমনি একটি পরিবারে যেখানে পিতা এবং মাতামহ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হলেও পরিবারে স্বদেশীয়ানার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। তখনই তৈরী হয়েছিল জীবনে আর্দশ নিষ্ঠার গভীর মূল্যবোধ এবং স্বদেশের জন্য ত্যাগের ব্রত। লীলার নিজের কথায় তিনি একজন " আত্মনিবেদিত বিপ্লবী"। স্বদেশ সেবার লক্ষ্যে ও দেশের স্বাধীনতার জন্য গনআন্দোলন করেছেন; নারীর রাজনৈতিক ও শিক্ষার অধিকারে সোচ্চার হয়ে গঠন করেছেন সারা বাংলা নারী ভোটাধিকার কমিটি, দিপালী সংঘ। 'জয়শ্রী' হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার যেখানে "রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে এমনভাবে জয়শ্রীর মর্মবাণীটিকে ভাষা দিতে পারতেন।" লীলা একাধিক বার কঠোর কারাবরণও করেছিলেন। আসলে "নতুন সমাজ, নতুন মানুষ গড়তে হবে " — এই চরম লক্ষ্যের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেনি তিনি। সারা ভারত ফরওর্যাড ব্লকের মধ্যে তিনি এবং তাঁর স্বামী বিপ্লবী অনিল রায় পেয়েছিলেন তাঁদের এই আর্দশকে বাস্তবায়িত করা ও চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার মাধ্যম। কিন্তু জীবনের বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে লীলার জীবনে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর এগিয়ে চলার প্রধান সম্বল।

জাতির জীবনে প্রতিটি সঙ্কট মুহূর্তে লীলা অনুভব করেছেন কবির উপস্থিতি। প্রথম যে স্মৃতি লীলার কাছে ভাস্বর তা ছিল ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ-এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও কবির নাইট উপাধি ত্যাগ। কিশোরী লীলার মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এমনই এক মানুষ যিনি প্রাণের প্রাপ্তি ও প্রাচুর্য্য স্বদেশ ও বিশ্বকে একই সাথে

স্থান দিয়েছিলেন নিজের অন্তরলোকে।" লীলা দেখেছিলেন সেইসময় কবির রচনা কিভাবে স্বদেশী বিপ্লবী তরুণদের কাছে স্বদেশের জন্য সমস্ত রকম ত্যাগ স্বীকার ও মৃত্যুবরণ সহজ ও সুন্দর করে তুলেছিল।

তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সান্নিধ্যে আসবার সুযোগও পেয়েছিলেন লীলা। ১৯২৬ এ ঢাকায় দীপালী সংঘের একটি মহিলা সমাবেশে কবি প্রস্তাব দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে মেয়েদের কর্মপরিচালনার দায়িত্ব লীলাকে গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু লীলা সেই আহ্বানে সাড়া দিতে পারেননি " আমার পথের নিশানা ততদিনে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর অনুরোধ রক্ষার অক্ষমতা জানাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। কবি বুঝলেন।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছেন প্রতিটি মুহূর্তে একান্ত নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হিসাবে। ২৬শে জানুয়ারী ১৯২৮ এ কোলকাতায় মনুমেন্টের তলায় সুভাষচন্দ্র বসুর উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে ঢাকায় মহিলারা এমনকি অন্তঃপুরিকারাও সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। কবির গানের মধ্যে দিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন "ওঁদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে মোদের।" লীলার মনে হয়েছে, " সারা জাতির সে দুঃসহ অপমান ও রুদ্ধ ক্ষোভকে কে এমন শংকাহীন দুর্বার ছন্দ দিতে পারত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া।" ১৯৩১ সালে হিজলীর বন্দী নিবাসে জাতিয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে নিরস্ত্র বন্দীদের গুলি করে হত্যা করা হয়। জাতীর সেই চরম লাঞ্ছনার ও দুঃখের দিনেও, লীলা দেখেছেন, যে কবি একান্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে টাউনহলের বিশাল প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১৯৩১ এ লীলার কারাবাস শুরু হয়ে। দীর্ঘ ছয় বছর কারাবাসের সময় বেঁচে থাকার রসদ হয়ে উঠেছিল- "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থটি - "প্রতিদিন ভোররাতে লক্ আপ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মহুয়াখানি নিয়ে সেলের অল্প পরিসর উঠোনে বেরিয়ে পড়তাম আমি ও আমার এক তরুণী সঙ্গিনী।" কবিকে জানিয়েছিলেন সে কথা।

কবির প্রয়াণ কিছুমাত্র প্রভেদ সৃষ্টি করেনি লীলার জীবনে কারণ কবিকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন হৃদয়ের অন্তর্লোকে, কবির দানকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, "মানুষের বিভিন্ন সময়ের সকল মনোভাবের অনন্যসাধারণ দোসর হিসাবে"। প্রাক্-স্বাধীনতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উত্তাল, অস্থির সময়ে কবি হয়ে উঠেছিলেন তাঁর এগিয়ে চলার প্রেরণা, শক্তি। ১৯৪৬ এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে গান্ধীজী গেছেন। লীলা ও তাঁর ন্যাশানাল সার্ভিস ইনস্টিটিউটের সহকর্মীরাও আছেন। সন্ধ্যায় গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীরই দুটি প্রিয় কবির রচিত গান " হিংসায় উন্মত্ত

পৃথ্বী" এবং "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে" গাওয়া হল। লীলার স্মৃতি চারণায় উঠে এসেছে "ভারতের কবি, বাংলার কবিকে সেদিনের সেই বেদনাস্তব্ধ সন্ধ্যায় আবার নতুন করে পেলাম আমরা সেইক্ষণে।"

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের কয়েক বছর পর লীলার জীবন দীপও নিভে গেছে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে, মূর্ত ও বিমূর্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছেন তাঁর হৃদয়ের নিভৃতে। লীলার কাছে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নয়, বিশ্ব মানবতার প্রতীক রূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন। কবির জন্ম শতবর্ষে লীলাও কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন

"সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালবাসিলাম
সে কখনও করেনা বঞ্চনা।
আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

Recourse to World of Innocence

A Reading of mother-child relationship in Rabindranath Tegore's 'The Crescent Moon'

Soma Mandal
Department of English

'The Crescent Moon'-- a collection of the poems translated[1] into English from Rabindranath Tagore's Bengali work 'Sisu' - uniquely records the quintessentially pristine quality of mother-child relationship. As we read the poems in the collection we find the Poet speaking for the every parent or every child -- thus transcending the familiar and attaining a universal voice which is true of all ages and all the time.

When Tegore worte the Sisu poems he was not enjoying the happy bliss of a family life. On the contrary, his mind was overcast with the gloom of bereavement : he has just lost his wife. Within a few months his second daughter Renuka fell ill and the poet had to take her to Almora. During this period -- ' a period of a great dejection and anxitety'[2] -- the poet wrote the poems for children. However, the poems served him dually -- on one hand he could entertain the ailling daughter who was not yet thirteen, on the other, his own suffering soul could find a solace in the blissful world of innocence.[3]

'Only those'- Lila Majumder observed[4] - in whose minds the memories of their own childhood remain fresh and fair as the dawn can write for children,.....' As we read the poems in 'The Crescent Moon' we also have a glimpse into that world of Tagore's childhood. Being the fourteenth child of his parents he was not the one who grew up under constant vigil of his parents. Far from being pampered he was rather brought up 'austerely'[5] like other children of his family. His childhood days were 'spent between the servent's room and the classroom, ' and he never had 'his due share of a mother's love'[6]. Tagore's mother Sarada Devi 'had little time or inclination to look after her youngest born, it is not surprising. Her motherliness

has been taxed to the utmost and she had perhaps little surplus left to spare. But the hunger for a mother's affection, never appeased in childhood, was to survive in the son as a recurring longing for feminine affection and care. Its haunting echoes can be heard in the exquisite child-poems he wrote in the peak of his manhood, some of which was later published in English translation as "The Crescent Moon".'

Some poems in 'The Crescent Moon'[8] are written from the perspective of a mother and how wonderfully the poet becomes a mother himself ! 'He has, in truth, known how to see the child with the mother's eyes and the mother with the child's;'[9] . In 'The Beginning' the poet voices the sentiment of a mother who exalts in the myth of creation of which she is a part; the child is a bliss to her :

'Heaven's first darling,twin-born with the morning light,
you have floated down the stream of the world's life,and at last you have stranded on my heart.
As I gaze on your face, mystery overwhelms me; you who belong to all have become mine.'

'The Judge' is another wonderful poem in which we find the affectionate mother following her own logic in dealing with the failings of her child :

'When I must punish him he becomes all the more a part
of my being.
When I cause his tears to come my heart weeps with him.
I alone have a right to blame and punish, for he only chastise who loves.'

In the poem 'Defamation' the mother is too anxious as she finds her child full of tears and indirectly criticises those who are responsible for her child's suffering:

'Why are those tears in your eyes, my child?

How horrid of them to be always scolding you for nothing!'

To her the child is as flawless as the moon so she asks '... Would they dare to call the full moon dirty because it has smudged its face with ink?'

On the other hand there are poems in which the Poet speaks for the child himself. Lila Majumder records 'There was once a gentle and thoughful little boy, whose days were spent mostly in the custody of servants, little first-floor window overlooking a pond, dreaming in an old abandoned palanquin.....When this child grew up he remembered these incidents and the colours they cast on his mind. It was to this child that he addressed himself, whose loneliness he comforted, whose questionings he reiterted.' [10] The child lives in a world of his own: In 'The Crescent Moon' there are some poems in which the poet uniquely describes this illusory world which is a reality to every child. The sceptics will not be convinced of its existence, therefore the child allows his mother the only access into this world:

If people came to know where my king's palace is, it would

vanish into the air.

The walls are of white silver and the roof of shining gold.

The queen lives in a palace with seven courtyards and

she wears a jewel that cost all the wealth of seven kingdoms.

Palace is.

It is at the corner of our terrace where the pot of the tulsi

plant stands.' (Fairyland)

'The Hero' is another wonderful poem in which the child makes an imaginary journey with her mother and satisfies his

desire to impress his mother with his heroism:

But I come to you all stained with blood, and say, 'Mother,

the fight is over now.'

You come out and kiss me, pressing me to your heart, and

you say to yourself,

'I don't know what I should do if I hadn't my boy to escort

me'

In the poem 'Twelve o' clock' the child is passionately asking his mother to allow him to leave off his studies; he evokes beautiful scenes of nature in his imagination:

'I can easily imagine now that sun has reached the edge

of that rice-field,and the old fisher-woman is gathering herbs

for her supper by the side of the pond.

.....

If twelve o'clock can come in the night, why can't the night come when it is twelve o'clock?'

In the poem 'Merchant' the child imagines he will make an imaginary journey into the unknown all alone. But before he starts, he is assuring his mother that he will bring gifts for her -- gifts that will please her immensely.

'Mother, do you want heaps and heaps of gold?

There, by the shade of the forest path the golden champa flowers drop on the ground.

I will gather them all for you in many hundred

baskets.'

The child is tempted to join the world of clouds and the waves but

cannot do so for the simple reason that he cannot bear the pain of leaving his mother alone. So he imagines his mother to be the moon and himself the cloud

'I shall cover you with both my hands, and our house-top

will be the blue sky.

.....

I will be the waves and you will be a strange shore.

I shall roll on and on, and break upon your lap

with laughter.

And no one in the world will know where we both are.'

'The Further Bank' is another poem which moves our heart. The child-speaker yearns to make a journey to the further bank of the river--it is a place of wonder becuase all beautiful scenes awaits him there. 'Where in the evening the tall grasses crested with white flowers invite the moonbeam to float upon their waves.' The child wishes to be the boatman of that ferryboat but not without the permission of his mother : 'Mother, if you don't mind, I should like to become the/boatman of the ferryboat when I am grown up.' He also assures his mother that he will return to his mother in the dusk.

This theme of returning to mother is a recurring one in the poems. In "The Champa Flower' the child again plays with his mother but wherever he goes even in his imagination he ends up coming back to his mother.

'When in the evening you went to the cowshed with the

Lighted lamp in your hand, I should suddenly drop on to the earth again and be your own baby once more, and beg you to tell me a story.'

In 'Baby's Way' the poet records the unique relationship between the mother and the child: 'If baby only wanted to, he could fly up to heaven this moment.

It is not for nothing that he does not leave us.

He loves to rest his head on mother's bosom, and cannot ever bear to lose sight of her.'

In 'Unheeded Pageant' the Poet finds the whole world sharing the enjoyment of the child : 'The wind carries away in glee the tinkling of your anklet bells.

.....

The world-mother keeps her seat by you in your mother's heart.'

The realization of finding one's mother as a part of the universe dawned upon the poet at an early age. The poet lost his mother at a tender age; he did not comprehend the true nature of the loss immediately. The death seemed to be only a 'shadow'[11]. The poet records: 'When death suddenly came, and in a moment tore a gaping rent in life's seamless fabric, I was utterly bewildered. All around, the trees, the soil, the water, the sun, the moon, the stars, remained as immovably true as before, and yet the person who was as truly there, who, through a thousand points of contact with life, mind and heart, was so very much more true for me, had vanished in an instant like a dream.'[12] But the feeling of loss though irreparable was felt in a larger perspective.

'In later life, wandering like a madcap at the first coming of spring with a handful of half blown jessamines tied in a corner of my muslin scarf, as I stroked my forehead with the soft rounded, tapering buds the touch of mother's fingers would come back to me ; and I clearly sensed that the tenderness dwelling in the tips of those fingers was very same as the purity that blossoms every day in jessamine buds, And I felt that this tenderness is on the boundless measure whether we know it or not.[13] We recall the line where the poet says through the voice of the child:

I cannot remember my mother

only when from bedroom window

I send my eyes into the blue of the distant sky

I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. (Mone Para) Remembering

* Sisu Bholanath

These are the words in which every bereaved soul whoever lost their mothers will find a solace.

Note:

1. Tagore himself did the Translation.
2. Krishna Kripalani, *Rabindranath Tagore, A Biography,* Visva Bharati, 1980 p.204
3. Upendranath Bhattacharya, *Rabindra-Kavya-Parikrama*, Orient Book Company, p 460-461
4. Lila Majumder, *Tagore as a Writer for Children, A Centenary Volume Rabindranath Tegore (1861-1961) Sahitya Akademi, pub Nov. 1961 p172.*
5. Krishna Kripalni, *Rabidranath Tegore, A Biography,* Visva Bharati, 1980 p.38
6. Ibib., p.55
7. Ibid., p.38
8. All the quotations of the poems are taken from Rabindranath Tagore Omnibus III Rupa & Co 2005 (The Crescent Moon)
9. Ernest Ruhys, *Rabidranath Tagore, A Biographical Study Maccmillan And Co.,1917 p. 78*
10. Lila Majumder, *Tagore as a writer for Children,A Centenary Volume Rabidranath Tagore(1861-1961) Sahitya Akademi,pub Nov p. 174*
11. Rabidranath Tagore, *My Reminiscnces p. 178*
12. Ibid., p.179
13. Ibid., p.178

INVITED ESSAY

TAGORE AS AN ENVIRONMENTAL THINKER

Dr. Pranab Kumar Chattopadhyaya

Department of Economics & politics
Visva- Bharati, Santiniketan.

Rabindranath Tagore was generally remembered as a poet .and mainly for his literary genius. Recently there is some revival of interest of his contribution to other areas . He was greatest humanist and a political prophet and throughout his life he struggled against economic exploitation, political subjugation, social injustice and religious intolerance. He was also very much provoked by the environmental questions and was definitely convinced that environmental situations were getting bad and ever deteriorating. He composed many poems and essays about our understanding of Nature and various environmental issues. He thought that If the exploitation of nature goes beyond a tolerable limit and injures the resilience of the system the balance is lost. In this essay Rabindra Nath Tagore's views as an environmentalist is discussed in this cross-cultural context. In his days the problem of water and air pollution, municipal waste problem, habitat destruction, resource depletion and global greenhouse problems were not properly understood and recognized. His sensitive mind went further the anthropocentric and bio-centric views to understand the sacredness of the natural world. He predicted the erosion of values and unbridled consumerism and impending ecological crises and showed the way to enjoy the harmony with all existence.

I

Recently the concern for protecting the environment has gained momentum. Much earlier both Tagore and Gandhi, the great Indian thinkers, anticipated the essentials of the dark sides of unrestricted exploitation of natural resources necessary to satisfy the needs of

emerging industries. Nature has become the source of raw materials and sink for dumping the unwanted residues. The new and improved methods of production have thoroughly altered the natural world. The mankind has been confronted by a series of ominous, seemingly intractable crises due to the depletion of natural resources and environmental degradation. The condition of mass production, both industrial and agricultural, has dramatically altered the natural world. This has also damaged the human sensibility and man's harmonious relationship with nature. There was sufficient lack of alertness among the western thinkers to understand the consequences of unrestricted exploitation of natural resources for satisfying human greed. Indian thinkers, mentioned earlier, have unique originality to anticipate the transformation taking place in the natural world due to human actions and its impact on human well-being.

The term *progress is* of considerable historical importance. Now we are not in a position when we were thousands of years ago. The pattern of development is not necessarily linear, rather cyclical. We have also noticed that the quality of environment in which man live changed over time. We have seen that there were qualitative leaps and remarkable discontinuities in this process. There was sudden rise of civilization in Greece and also there were early civilization in Egypt, Mesopotamia and India. Thousands of years ago in the early and rude state of society—— in the days of savages, where there were only hunters and fishers, every individual who was able to work had to work for existence. He, besides, providing the necessaries and conveniences of life for himself, provided the same to the old, infirm and young who could not work. But now the produce of the earth is so great that all are often abundantly supplied with the necessaries and conveniences of life even when a great number of people do not labour at all. Thus the view of progress is depicted by Adam Smith in his *magnum opus "WEALTH OF NATIONS."* Early man lived on what was immediately offered to him by nature; by hunting, fishing and gathering fruits from the woods. In the course of time there is progress and man has learnt to transform what he receives

from his surroundings. He has been able to identify both the favourable and harmful elements in nature. He attempted to use and control those processes of nature which are useful to him and eliminated and tamed those which are harmful to his existence and progress.

In history we find two major steps towards the independence of man from the variability and the unreliability of the natural surroundings. The first step took place in 8000 B. C. that led to the domestication of animals and cultivation of land while the second step took place with the industrial revolution that started in the last quarter of the 18th century. Now we are at a higher stage of the second revolution that is identified with immense improvement in information technology and space science. Only at this stage we are able to understand some of the evils of development.

II

The economic growth which has dominated society for so long has reached an impasse. We like material affluence and with it clean environment—clean air, pure water and unspoiled land. But in the course of progress human activities have disrupted the intricate balance of the natural eco-system. It has irreversibly degraded. It is a fact that progress is impossible without exploiting the nature and we have already finished many of earth's vital resources. Human activities have dangerously altered the atmospheric chemistry. Population growth has, perhaps, surpassed the carrying capacity. Mankind is heading towards dire and irreparable consequences.

Human civilization has been encroaching on environment for ages. There are large-scale deforestations with the process of industrialization and urbanization. There has been irredeemable exploitation and extraction of the exhaustible mineral resources. We have in this context a dismal prediction from the Neo-Malthusians. Excessive use of finite resources, and human impact on global environmental change resurrected the concept of 'limits

to growth' epitomized in the reports of Club of Rome on the predicament of mankind. Malthus was not an environmentalist. His visions that growth can not be secular owing to the fact that production will be outrun by reproduction and the present day concern ' limits to growth' is regarded as a Malthusian concern.

"If present growth trends in world population, industrialization, pollution, food problems, and resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this planet will be reached within the next one hundred years. The most possible results will be a rather sudden and uncontrollable decline in both population and industrial capacity."(The Limits to Growth, p.23)

We know that prudence can be folly, also know that what is prudence today can be a folly on a later date. We have understood the ills of industrialization and have the concern for the environment in the 1960s and 1970s with little practical success. The horizons of the debate on development have subsequently broadened and the environmentalist movement began to be well-organized. A series of major environmental campaigns reached to the public realm and the issues are acknowledged by national governments and international organizations.

III

Thus we understand that the deterioration of environment affects the quality of human life on earth. How mankind should act to contain this problem? Western philosophy views that human activity towards nature should be guided by human preference alone. The dominant ethical tradition of the western world holds that only human beings have independent moral status, matter in themselves. It supports the belief that other things both living and non-living, exist for our use and have no value except their instrumental value to us, and one can do what one pleases with one's abilities. This view is often called (by Aristotle) anthropocentricism or human chauvinism. They resorted to Benthamist Utilitarianism as an answer to this problem and also

kept the old Aristotolian view of anthropocentricism of the universe. That everything in the universe is for man and man must use these for his benefits and pleasure.

This led to the ideas of hedonism, the pleasure is the most desirable and the maximization of pleasure can be the fundamental doctrine for human actions. John Stuart Mill followed Bentham and both were for egoistic hedonism. The claim is that—happiness is good; that each person's happiness is good for that person; the general happiness is good to the aggregate of all persons.

IV

The anthropocentric view of utilitarian ethics is predominant in social sciences. What is overlooked is that Bentham took sufficient care to extend its domain to cover other animals. In environmental ethics, especially in the context of bio-diversity—its importance is not negligible. Thus Bentham attempted to extend the rights and hedonist goods to cover animals. In the 1920s there were attempts to cover the whole of biotic world under this category. There was a movement past a hedonistic humanistic logic to a bio-logic. Pains, Pleasures, psychological experiences are no longer the useful categories. There is an advancement—— we are extending, logical, propositional, cognitive and normative categories to the realm of biology. Thus we have moved slowly from humanistic utilitarian ethics to bio-ethics.

We have seen that there are thinkers who surpassed the dominant views in western thought that are also contrary to the view of anthropocentrism. John Stuart Mill and even David Ricardo argued against the unrestricted growth. But their views went unnoticed also they failed to gain ground. David Ricardo, the founder of the abstract economic science, considered economic growth as a desirable economic objective and strongly recommended material prosperity of the country in which he lived. He was ready to accept moderation in the face of limited and

restricted population growth. In a famous letter Ricardo gives expression to his attitude to wealth. He says "too much wealth would I fear spoil you, too little would make you suffer privation. I like neither extreme. There is a medium most favourable to independence of character, and to the cultivation of the mind, and it is this medium quantity which I desire for you." (Ricardo's letter to Mary Ann, in Ricardo's Works, ed , Sraffa & Dobb, Vol. X. P.165. Quoted in THE ECONOMICS OF AUSTERITY, by PROFESSOR A.K. DASGUPTA,p.2). J S Mil was aware of the social cost inflicted on society by unrestricted economic growth. He went romantic when he described it. He said:

"with every rood of land brought into cultivation, which capable of growing food for human beings, every flowery waste or natural pasture ploughed up, all quadrupeds or birds which are not domesticated for man's use exterminated as his rivals for food, every hedgegrow or superfluous tree rooted out, and scarcely a place left where a wild shrub or flower could grow without being eradicated as a weed in the name of improved agriculture—————— If the earth must loose that great portion of its pleasantness which it owes to hinges that the unlimited increase of wealth and population would extirpate from it, for the better or a happier population, I sincerely hope, for the sake of prosperity, that they will be content to be stationary, long before necessity compels them to it". (J .S. MILL quoted in A. K. DASGUPTA'S *ECONOMICS OF AUSTERITY* P.2)

V

This short excurses reveals the intellectual tradition that evolved in the west to answer the query of human responses to the problems of human actions under any circumstances. It is necessary for the cross-cultural understanding in the context of environmental problems affecting us in these days. Their civilization is caused by industrialism while ours' have taken birth in the woods. In the oriental ethos there is no conflict with the ideals of 'individual freedom' and the concept that 'pleasure is the highest good'. There

are only differences in perception. Western ideals are always for possession and enjoyment of wealth while Eastern seems to take the opposite course. Our civilization taught us with little material possession we can do with. Here we put emphasis on the harmony that exists between the individual and the universal. Our seers have extended the ethics further and it is not anthropocentric or bio-centric but transcendental. Here individual is an integral part of the interconnected cosmos and his ideal is to perceive a sense of unison with all aspects of the universe. We believe that any action by us will develop a ripple in the system and it will always hit back. Putting Tagore in this context we can do justice to his ideas. Tagore was aware of the ills of industrial society—the erosion of values and ecological crises of contemporary Europe. He was very much unhappy with the way the European value system with its basic focus on material wealth, strong individualism, selfishness and greed gradually replaced the coherent set of our traditional value system, attitude based on renunciation, our belief in the sacredness of the natural world, reciprocity of transactions between groups in our society. Like Europe, India also institutionalized several vices like pride, selfishness and greed.

Ancient Indian thoughts and civilization developed the culture of worshipping nature. There was a tradition of environmental conservation – a natural system of conservation — in India from ancient times. It is embedded in her different religious and cultural practices. There were rituals of worshipping trees and practices of tree plantations those contribute to human existence. The Aranyakas are composed in the woods, ashramas—the educational centre of early Indian scholars; in the sylvan surroundings and inspiring landscape. They cultivated the beautiful and immortal relationship between man and nature. They practiced the philosophy of harmony with Nature against western concept of conflict with Nature.

Indian tradition down the centuries recognized five elemental forces and their contribution to the existence of life in

this system. Earth, water, fire, air and sky sustain life (not only human life) through an intricate interplay among themselves and maintain balance in the system. If the exploitation of nature goes beyond a tolerable limit and injures the resilience of the system, the balance is lost.

VI

Tagore was born and brought up in the rich cultural traditions practised in his family. He toured all the industrial countries of the world. These acquired knowledge and experiences helped him to understand the deterioration of the physical conditions due to industrial revolution. In his days problems like water and air pollution, municipal waste problems, loss of wilderness area, habitat destruction, threats to bio-diversity, resource depletion and global greenhouse problems were not properly understood and recognized. Still, to a sensitive mind doomsday scenarios were imaginable in which success of growth leads to its own demise. He clearly understood the basic links between industrialism, consumerism and militarism. He composed 'MUKTADHARA' by seeing the evils of large dams elsewhere in the world. He was not against small dams and use of modern technique of production but it should be up to a limit so that the resilience of the system is not damaged. He was not against growth but he was against mindless and boundless growth.

His ecological philosophy was neither totally oriental nor totally western but a mixture of both. He made a synthesis of Indian cultural attitudes to the natural world—a heightened sense of unity with the nature— with the limited consumerism of the West. Further he attempted to assimilate the broad currents—unity of everything—a rejection of Cartesian and Baconian advancement of humans' dominance over the natural order and their exploitation. Indian thinkers offered a psychological equivalent of the modern ecological processes—a sense of unity between the visible and invisible world—— that is rarely described in western philosophy.

barrenness of the earth by inviting the small plants those would be large trees in future getting supports from the earth and the rains from the clouds in the sky. There are poems dedicated to the five elemental forces that cause and sustain life in this planet. These are not only his imaginations but he infused them in the core process of living of the people. In his book SADHANA he described that India had chosen her places of pilgrimage wherever the nature possesses special grandeur and beauty—- where her mind would be free from narrow necessities and matter-of-fact life and find a sense of unison with the all aspects of the universe. He founded Visva-Bharati to impart a unique education to young minds so that they could feel and understand that there was an inseparable bond between man and nature. He wrote:

"Education divorced from Nature has brought untold harm to young children. The sense of isolation that is generated through the separation has caused great evil to mankind. The misfortune has beset the world since a long time ago. That is why I thought a field had to be created which would facilitate contact with the world of Nature. That is how the institution came to be founded." (Rabindra Nath Tagore, VISVA-BHARATI, 1358 B.S.pp77-78)

Tagore ranged diverse fields to which human emotions, passions and intellect can reach. He used his received impressions from the surroundings in his own way and shed illuminations in every field. He adorned whatever he touched. His perception of the relationship between man and nature was not dry and barren but had an infusion of the will and affection. He travelled to nature instead of books, authorities and tradition to understand the character of the problem. His thoughts and ideas were not captured in the cobweb of dogmas and traditions.

He understood the forms of the phenomenon to its secret nature and inner essence. His literature is not merely the photographic

depiction of nature but an exposition of objective nature through our emotions. His superior and delicate mind understood the contemporary reality and he tried to develop a philosophy of integration, preparing an international and intercultural programme for unleashing creative and humanistic attitudes and values those are beyond orthodoxy and dogmatism.

BIBLIOGRAPHY:

1) Bentham J : *Principles of Political Economy*, in Collected Works, Ed b Burns J. H. & Hart. H. L. A, 1970, London, Athlone, London.

2) Bentham J : *Introduction to the Theory of Morals and Legislation*. In Collected Works, Ed by BurnsJ. H. & Hart. H. L. A ,1970,London, Athlone, London.

3) Benson John : *Environmental Ethics: An Introduction with Readings*, 2000 Routledge, London.

4) Dasgupta A K : *Economics of Austerity*. 1975, OUP, New Delhi.

5) Malthus T R : *An Essay on the Principles of Population*, 1803, Johnson, London.

6) Marshall A : *Principles of Economics*,1890, Macmillan, London.

7) Medows D L et al : *The Limits to Growth*, 1972, Earth Island.

8) Mill J : *Principles of Political Economy With Some of Their Applications to Social Philosophy*, 1847, ed by Ashley A M Kelley, New York.

9) Mondal S. (ed) : *Aspects of Environmentalism*, 2003, Visva-Bharati.

10) *Ravindra Rachanavali* : Published by the Govt of West Bengal for Vanavani, Muktadhara and Sadhana.

11) Rolston III H : *Environmental Ethics*, 1988, Temple University Press London.

12) Smith A : *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Ed by Edwin Cannan, 1937, Modern Library, NY.

9) Mondal S. (ed) : *Aspects of Environmentalism*, 2003, Visva-Bharati.

10) *Ravindra Rachanavali* : Published by the Govt of West Bengal for Vanavani, Muktadhara and Sadhana.

11) Rolston III H : *Environmental Ethics*, 1988, Temple University Press London.

12) Smith A : *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Ed by Edwin Cannan, 1937, Modern Library, NY.

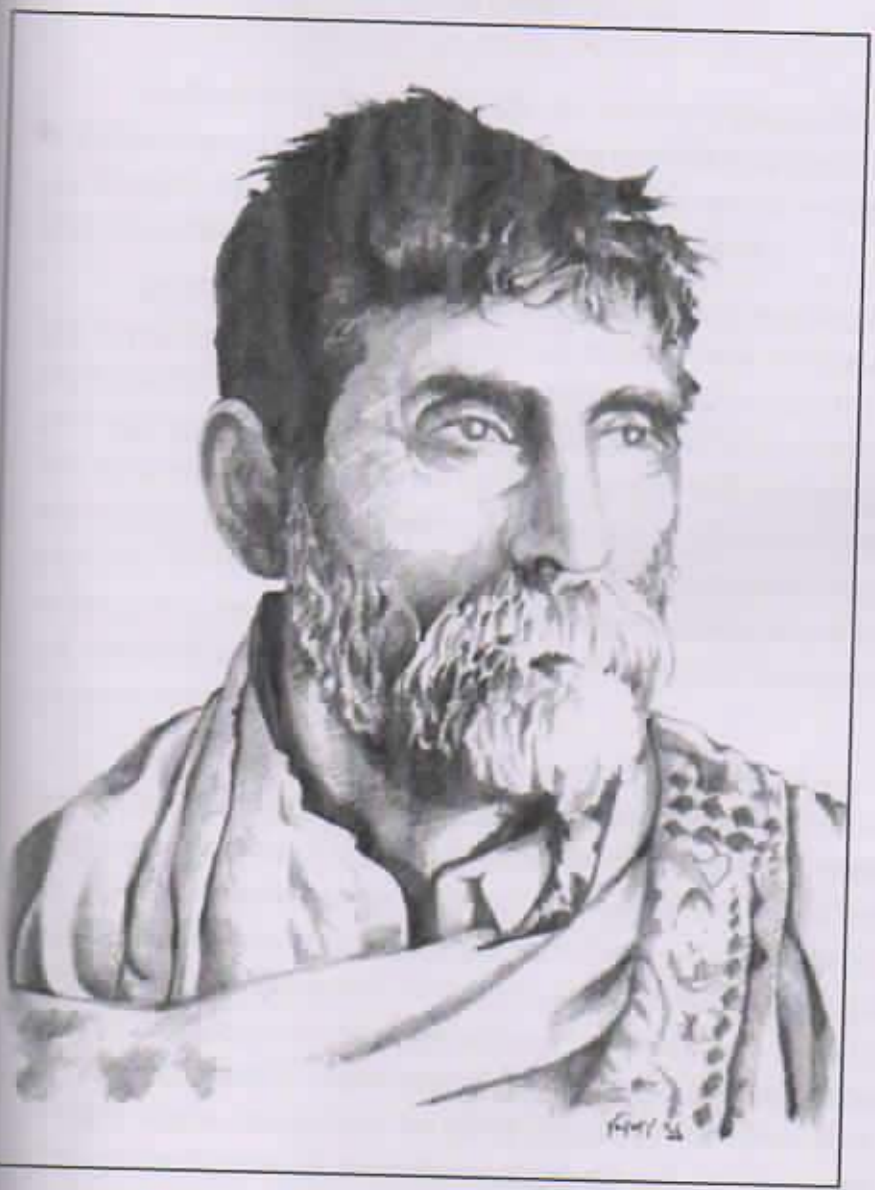

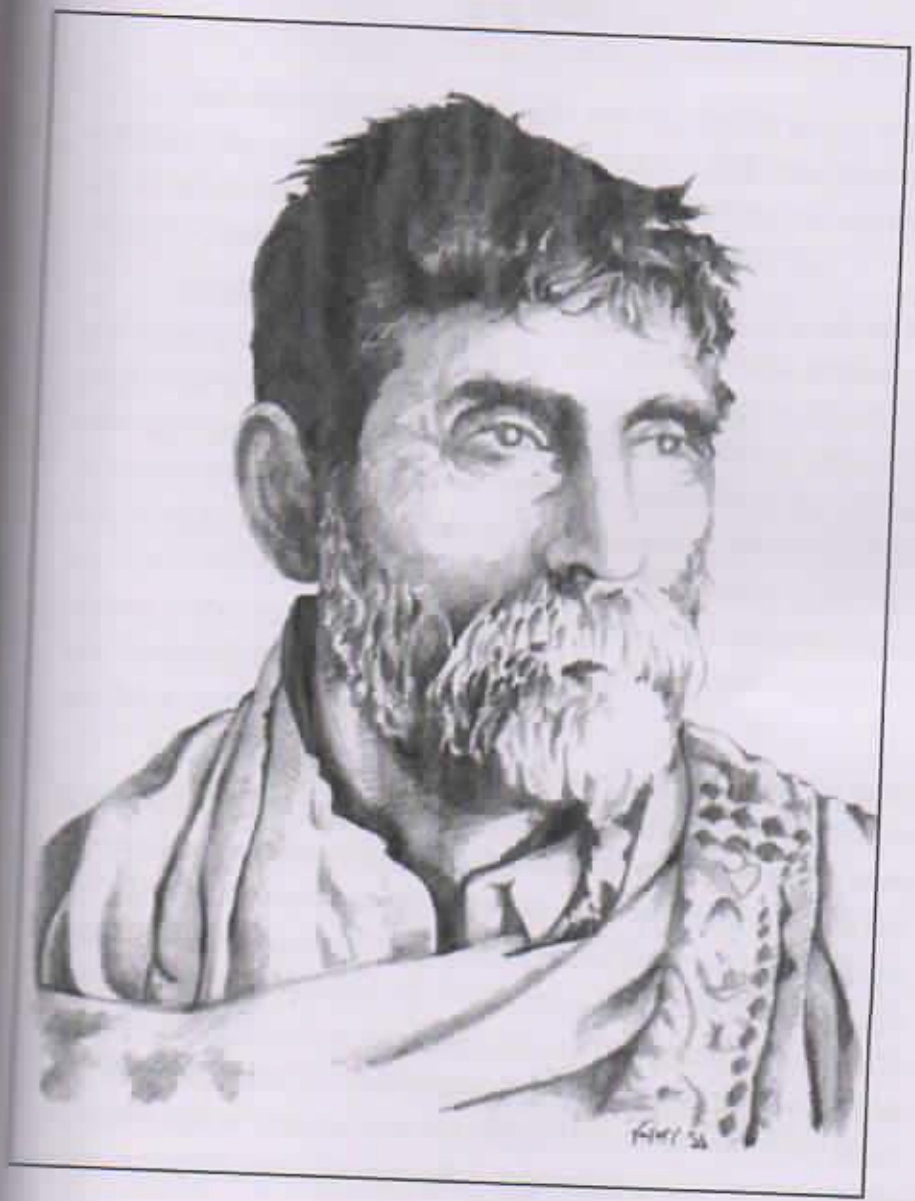

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিল্প ও বাণিজ্য ভাবনা

দীপক কুমার নাথ
বাণিজ্য বিভাগ

একটি জাতির জীবনের মাইলষ্টোনগুলি গড়ে ওঠে কিছু কিছু মানুষের সাফল্য ও কীর্তিকে কেন্দ্র করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর জীবন ও তাঁর নানা কীর্তি সমস্ত ভারতবর্ষের এক ইতিহাসের উপাদান, এক মাইলষ্টোন যা বাঙালীর উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক ও আধুনিকতার দিক্ নির্ণয় করে দেয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি এবং তাদের ভবিষ্যতের প্রতি চিন্তাভাবনা যে কতখানি জীবনমুখী ছিল এবং আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক সে প্রসঙ্গে তাঁর কিছু মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। যে কথা গুলি তিনি বলেছিলেন প্রায় একশ বছর আগে। মধ্যবিত্ত বাঙালির আর্থিক ভবিষ্যৎ তাঁকে ভাবিয়ে তোলে এবং তিনি মন্তব্য করেন .... " যে শিক্ষায় শুধু মেরুদণ্ডহীন গ্র্যাজুয়েট তৈরী হয় মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না, যে শিক্ষা আমাদের 'করে-খেতে' শেখায় না, দুর্বল অসহায় শিশুর মত সংসার-পথে ছেড়ে দেয় সে শিক্ষার প্রয়োজন কি?" জীবন সায়াহ্নে ১৯৪০ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বক্তৃতায় তিনি সকলকে সতর্ক করে স্মরণ করিয়ে দেন "ভারতবাসী এখনও ফেরো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ে মন দাও তবে যদি বাঁচতে পারো, নইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নেই ।"

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসনে শিল্প স্থাপনে সেরকম কোনো সরকারি উদ্যোগ ছিল না। ইংরেজদের বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশের ফলে ভারতবর্ষ হয়ে উঠল ইংরেজদের উৎপাদিত শিল্প পণ্যের বাজার এবং কাঁচামাল আমদানির কেন্দ্র। পরিকল্পিত ভাবে কুটিরশিল্প ও কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্পগুলির ধ্বংস এবং কৃষি ও কুটির শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভারতবর্ষের গ্রামীন অর্থনীতিতে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টির হোল এবং দেশে নেমে এল দারিদ্র ও বেকারত্বের মত বড় সমস্যা। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলেন একজন তরুণ বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করার পর থেকেই তিনি দেশের শিল্প বাণিজ্য চিন্তায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের হৃত সর্বস্ব দশা তাঁকে আকুল

করে তুলেছিল আর তিনি গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে শুধু নিজেকে বন্দী না রেখে - বাস্তবধর্মী শিল্প-উদ্যোগ স্থাপনে পথ প্রদর্শক হলেন।

শিল্প গড়ে তোলার জন্য তরুণ প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মগ্ন হলেন— একই সঙ্গে আমাদের দেশের অজস্র প্রাকৃতিক সম্ভারকে কিভাবে শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায় এ সম্পর্কে তিনি গভীর চিন্তাভাবনা করলেন। কম মূলধনে বাজারে যে সমস্ত জিনিসের চাহিদা বেশী সেই ধরণের পণ্য উৎপাদনে তাঁর চিন্তাভাবনা ও কর্মপদ্ধতি আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক। প্রথমেই তিনি লেবুর রস বিশ্লেষণ করে সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন ও বাণিজ্যিক ভাবে তা উৎপাদন শুরু করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ লেবুর যোগানের অভাব ও উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ার ফলে লাভের পরিমান হয় অত্যন্ত কম—তখন তিনি এই উদ্যোগ থেকে ফিরে এলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি সেখানকার অনেক বড় বড় রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শন করেছিলেন এবং সেই সমস্ত কারখানায় প্রস্তুত উৎপাদিত পণ্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, দেখেছিলেন ঐ সমস্ত পণ্যগুলি ভারতবর্ষে রপ্তানী করে কত মুনাফা অর্জন করছে—এবার ভারতবর্ষেই এই পণ্যগুলির বিকল্প উৎপাদনের জন্য গড়ে তুললেন 'বেঙ্গল কেমিকাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। ১৮৯২ সালে নিজের বাসভবনে-৯১নং আপার সার্কুলার রোড একতলায় ভেষজ শিল্পের অসীম সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হোল তরুণ বাঙালী বিজ্ঞানীর শিল্প স্থাপনের ভিত্তি প্রস্তর। ২৫০ টাকা মাসিক মাহিনা নিয়ে যে এই ধরণের একটি কারবারের প্রতিষ্ঠা করা যায় তা সত্যিই স্মরণ করিয়ে দেয় প্রফুল্লচন্দ্রের অধ্যবসায় ও স্বদেশপ্রীতি। দেশকে এবং দেশের মানুষকে কতখানি ভালোবাসলে যে এই ধরণের বাস্তবধর্মী ও গঠনাত্মক কাজে মনোনিবেশ করা যায় তা প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ও কর্ম আলোচনা না করলে বোঝা সম্ভব নয়। প্রথম অবস্থায় যখন লোকসানের অঙ্কেই খাতা ভরে উঠত প্রফুল্লচন্দ্র তখন কারবারে নিজের পুঁজি অকাতরে ব্যয় করে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে ছিলেন। পরে যখন প্রতিষ্ঠা এলো, দেশের লোক তাঁর উৎপাদিত মাল খরিদ করতে লাগল - আয় বাড়তে শুরু হোল তখন পয়সার মোহে না মেতে ব্যবসার ভার তাঁর কৃতী ছাত্রদের উপর দিলেন। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের জুটল সম্মান, যশ ও অর্থ। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অসম-সাহস দৃঢ়-সংকল্প, শিল্প ও বাণিজ্যিক চিন্তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আজও তাঁর স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়াও প্রফুল্লচন্দ্র আরও অনেক দেশীয় শিল্প প্রবর্তনের

পশ্চাতে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস ও বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস এই দুটি শিল্প কারখানা গঠনেও প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০১ সালে শ্রী সত্যসুন্দর দেব নামে একজন তরুণকে জাপানের কিওটোতে মৃৎশিল্প শিক্ষার আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জনের জন্য পাঠান প্রফুল্লচন্দ্র এবং পরে তাঁর-হাতে এই শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হয়। ১৯১৯ সালে কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস - বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা হয় । ১৯২১ সালে দি বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন এই শিল্পে যোগদান করেন। তৎকালীন সরকারের অসহযোগিতা এবং বাঙালী যুবকদের কঠোর পরিশ্রমের অনিচ্ছা প্রফুল্লচন্দ্রকে ব্যথিত করে তুলতো কিন্তু তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন কিভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে কার্যে প্রয়োগ করা যায়। তিনি যে বিজ্ঞানকে বিদ্যা হিসেবে অর্জন করেছিলেন, সেই বিজ্ঞানকে আবার কর্মক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন দেশের ও মানুষের উন্নতির জন্য। চেষ্টা করেছিলেন দেশবাসীকে দুঃখ দুর্দশা নিরসনের পথ দেখাতে। কৃষির উন্নয়ন, গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প স্থাপন, জৈব সার তৈরী, ছোট ও মাঝারি শিল্প স্থাপন ব্যবসা বাণিজ্যে সমাজের অংশগ্রহন এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও উৎসাহ ছিল অতুলনীয়।

আজকের আধুনিক শিল্পায়ন ও কর্মমুখী প্রয়াস আমাদের কর্মধারাকে উজ্জীবিত করুক এই আশা আমরা করি।

প্রফুল্লচন্দ্র ভারতের দারিদ্র্যের কিছু কারণ এবং প্রতিকারের প্রতি যে আবেদন রেখেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চৌষট্টি বছর পরেও তা প্রাসঙ্গিক। কারণ হল এখনও তাকে কৃষির উপরই নির্ভর করতে হয়। পাশ্চাত্যে অনেক দ্রুত শিল্পায়ন হয়েছে - আমাদের দেশের দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানো উচিৎ।

A Tribute To A Great Son Of India On His 150th Birth Anniversary

Acharya Prafulla Chandra Ray

Glimpses of His Life

Dr. Ratna Bandhopadhyaya

Department of Chemistry

Mother India can boast of some of her Great Sons, Prafulla Chandra Ray being one of them. About 150 years ago the whole of Indian subcontinent was reeling under the pathos of the colonial suppression of the British. On one hand the people started storming the iron walls of the imperial rule from almost every corner of the subcontinent and on the other hand the Britishers were defending themselves with inhuman atrocities. The Sepoy Mutiny was a great jolt to the British. The demands of the society were not only political freedom but also educational upliftment, major social reforms and most importantly imbibing confidence in the potential of the people particularly the youth. It was at this time the Mother gave birth to some of her great sons.

Prafulla Chandra Ray was born on 2nd August 1861 in a village in the district of Jessore now in Bangladesh. His parents Harish Chandra Ray and Bhubanmohini Devi had an effective cultural and educational impact on him from child hood days .Ray was a voracious reader of English and Bengali classic, literature and history. The biographies of great people like Newton, Galileo and Benjamin Franklin influenced him. Thus grew his interest in western education and culture from boyhood. His father then decided to permanently shift to Calcutta for proper education of his children. Prafulla Chandra

and his elder brother Nalinikanta were admitted to the Albert School founded by Keshab Chandra Sen after a brief stay in Hare school. Very few families at that time stressed the importance of education, so Ray was fortunate enough. After passing the Matriculation Examination in the year 1879 Ray joined the Metropolitan College founded by Ishwar Chandra Vidyasagar in the Fine Arts Course. The reason being low tuition fee in this college at par with school education and it was also considered as a National Institution at that time. The selection of subjects was different from now. His subjects were English literature and Chemistry in the F A Course and Physics and Chemistry in the Bachelor of Arts Course. Ray's mentors in the college were Surendranath Banerjee, considered the father of Indian Nationalism who was professor of English prose literature and Prasanta Kumar Lahiri, Professor of poetry. Ray had to take up Chemistry classes in Presidency college as an external candidate under the guidance of Professor Alexander Peddler. Professor Peddler was a first rate hand in experiments and he had a high order of manipulative skills. Prafulla Chandra became unconsciously attracted towards the subject. During that time many dedicated teachers of English origin served education both in school and college levels. Ray's brilliance in academics and his craving for knowledge drew his father's attention and he longed to send his son to England for further study. Ray prepared for the Gilchrist Scholarship Examination which was conducted by the Edinburg University and open to students all over the world. Though it was equivalent to the Matriculation standard of the London University yet it required knowledge of four languages. Ray was proficient in Persian and English languages and had a workable knowledge of Sanskrit and Arabic. He was successful in the examination and was one of the two scholars from India. He set sail for England in the middle of 1882 with the blessings of his parents. Thereafter he was received by another bright Indian pursuing

his studies at the Cambridge University, Jagadish Chandra Bose.

Ray took admission in the B.Sc course of Edinburg University. In Edinburg he took part in an essay competition on "India before and after the mutiny". Though Ray did not get the prize his writings aroused and alerted the Englishmen about the developments in India. His patriotism was note worthy as was his writing skill. Prafulla Chandra enriched himself with a vast knowledge of English language and literature. The youth of around the age of twenty one or twenty two stormed the British parliament with his rare criticism of the colonial rule in England itself. In Edinburg he was taught by Sir Alexander Crum Brown. In 1885 Ray obtained his B.Sc degree and in 1887 he was awarded the D.Sc degree of the University of Edinburg in recognition of his work on "Conjugated Sulphates of the Copper-magnesium Group: A study of Isomorphous Mixtures and Molecular Combinations. "He was awarded the Hope Prize Scholarship which enabled him to stay one more year in England. He was also elected Vice President of the Chemical Society of the Edinburg University. Ray returned to India in 1888 with the aim of pursuing his researches in chemistry, to devote himself working in the laboratory. But the situation at home was not conducive for Indians trying to make a career in the academic world. The Educational Service was not only under British dominance, the Englishmen could not think of any Indian aspiring for the job with any regards of his merit. But fortunately for Ray one post for an Assistant Professor of Chemistry in the prestigious Presidency College needed immediate approval. Ray's application was granted though with letters of recommendation from Crum Brown, Alexander Peddler and many others. He joined the post with a monthly salary of Rs.250/-under the Provisional Educational Service and retired in 1916 as Professor and Head of the Department of Chemistry. After retiring from the Presidency College, Ray

joined the University College of Science at the invitation of Sir Ashutosh Mukherjee, the then vice chancellor of Calcutta University. In 1936 Ray retired from his service in the University College of Science but he continued as Emeritus Professor of Chemistry till his death.

Prafulla Chandra was introduced to research by Prof Alexander Crum Brown while in Edinburg. After coming to India he continued with his research at the Presidency College. His area of interest being mainly synthetic inorganic chemistry and the notable compounds prepared being mercurous nitrite and ammonium nitrite. Ray published his findings in the Journal of Asiatic Society of Bengal and again presented it before a gathering of the Chemical Society of London .His works were highly acclaimed by William Ramsay and W.E. Armstrong who pointed out that Ray was not merely a chemist confined within the walls of his laboratory and teaching but a true social being who was aware of his tasks before the society. He was compared with Frenchman and chemist Marcellin Pierre Eugene Berthelot, also a man of letters and politician. It was Berthelot who inspired Ray to undertake the monumental task of writing "The History of Hindu Chemistry" which was immediately recognized as a unique contribution in the annals of history of science. Ray published about 120 papers mainly in the Journal of Chemical Society London before 1924 when he took the initiative of launching the Journal of the Indian Chemical Society. It was the enthusiasm with which Ray motivated his students for a scientific career that he will be remembered for long as the true teacher of the society. His inspiration and confidence building among the young paved the way to the formation of the Indian School of Chemistry.

Ray was a staunch patriot. Being a government servant he could not participate directly with any movement but was associated with prominent leaders like Gandhiji , Gopal Krishna

Gokhle held effective discussions and shared views regarding the quicker path to "Swaraj". So once he commented "Science can wait but Swaraj cannot."He had a very extensive view of the society and started the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd. with the opportunity of creating jobs for the unemployed youth. This establishment drew much of Ray's time and attention but with the satisfaction that many chemicals, medicines and perfumes which had to be imported previously could be manufactured here. More importantly his inner zeal of Swadeshi became much more prominent. He could not only be called be called the Father of Indian School of Chemistry but also the Pioneer of Chemical Industries in India.

"A more remarkable career than that of P. C. Ray could not well be chronicled", wrote Nature, while commenting on the first volume of Ray's autobiography "Life and experiences of a Bengali Chemist". A Life of devotion of a great visionary who dreamt of political and economic freedom of his country worked hard with strength and passion, courage and confidence, happiness and sorrow to cherish the smile on the faces of his own countrymen. He died on June 16th, 1942 in his living room in the University College of Science of Calcutta University amidst by his students, friends and admirers.

INVITED ESSAY

PC RAY..... THE MODERN ENTERPRENEUR

Soumya Karfa
Student of St. Xaviers' College

2010 was a very important year celebrating the 150th birth anniversary of Acharya P.C.Ray and Rabindranath Tagore. Although the two were born in 1861 in two different parts of Bengal, and in completely two different family backgrounds... however they were linked somehow.

From the very childhood the son of Bhuban Mohini and Harish Chandra had a keen urge to gain knowledge. So even when Prafulla had to leave school for his attack of dysentery, he continued studying in home and in 1874 he joined Albert school.In 1879, he passed Entrance Examination & joined Metropolitan Institute. Finally with the "Gilchrist prize Scholarship" he left for Britain in 1882 where he joined the University Of Edinburgh .

This was rather a nut shell overview of his educational life..... but I am not here to describe his life story but to tell all that how he inspires us even in this ULTRA MODERN world of technology. So here, one incident of his life should be mentioned that enlightens the love for his motherland and also the courage to speak the truth.

There at the age of 21 he wrote an essay , "India Before And After The Mutiny", in a competition . Although it did not win any prize

but Prafulla Chandra distributed the article by printing at his own cost. The document gives the every detail of the period showing his

vast knowledge in all fields— contrary to our "note-based" education.

As Prafulla was a native of India, so when be came back to the land the then British Government refused to offer him a proper job. So for about a year(1888) he spent his time working with his famous friend Jagadish Chandra Bose in his laboratory.

In 1889 Prafulla Chandra was appointed as Assistant Professor of Chemistry in the Presidency College at Calcutta. He soon earned a great reputation as a successful and inspiring teacher. Prafulla Chandra left the Presidency College in 1916, and joined the Calcutta University College of Science (now known as Rajabazar Science College) as its first Palit Professor of Chemistry, a chair named after Tarak Nath Palit.

To know this great man in details we have to know his contribution to the world of chemistry. We can classify his works under 4 categories:

1. Mercurous Nitrite & related compounds
2. Ammonium Nitrite & Alkylammonium Nitrite
3. Organic Sulphur compounds
4. Coordination compounds

Preparation of $Hg_2(NO_2)_2$:

It was an accidental discovery , in order to prepare water soluble mercurous nitrate as an intermediate for synthesis of calomel he reacted dil. HNO3 with excess mercury, but he obtained yellow $Hg_2(NO_2)_2$.

$Hg\ (excess) + HNO_3 \longrightarrow Hg_2(NO_2)_2$

This was published in *" JOURNAL OF ASIATIC SOCIETY OF BENGAL"*

One of the very notable contributions of Prafulla Chandra in the field of Nitrite Chemistry was the synthesis of ammonium nitrite in pure form via double displacement between ammonium chloride and silver nitrite :

$$NH_4Cl + AgNO_2 \longrightarrow NH_4NO_2 + AgCl$$

Till then it was believed that ammonium nitrite undergoes fast thermal decomposition yielding N_2 and H_2O:

$$NH_4NO_2 \longrightarrow N_2 + 2H_2O$$

Prafulla Chandra established that this reaction is far less facile than thought. **Nature** magazine (August 15, 1912) immediately highlighted this successful preparation of 'ammonium nitrite"

In Presidency College , Prafulla Chandra Ray studied adulteration of food stuffs like ghee, butter, mustard oil and published a long report on this work in : *"Journal of the Asiatic Society of Bengal"(1894)*

PC Ray was extremely concerned about his fellow bengali brethren. He was extremely worried that these lazy people were not having jobs, they were ready to accept any one as boss but not ready to be the boss himself.....He wanted to flourish the indian economy, wanted to raise the youth from their deep sleep into the world of reality. He wrote in the then Bengal magazines :

Together with Rabindranath he also said :

সাত কোটি সন্তানেরে
হে মুগ্ধ জননী
রেখছ বাঙালী করে,
মানুষ করনি।

He was the man who realised that progress and industrialization are two sides of the same coin. He thus set up the famous : "BENGAL CHEMICAL & PHARMACEUTICAL WORKS" (1892).

Another facet of this great scientist cum enterpreneur is that of an Educator. As a teacher, in CU P.C.Ray, a lifelong bachelor had his quarters within the campus & his family included his students. The entire day of this great teacher was spent surrounded by his students who looked upto him as a GUIDING STAR, A FATHER, & A PHILOSOPHER.

He published the first volume of his autobiography *Life and Experience of a Bengali Chemist* in 1932, and dedicated it to the youth of India. The second volume of this work was issued in 1935.

He was never tired and always said :

'... WHEN WORK IS COUPLED WITH A KEEN SENSE OF ENJOYMENT IT DOES NOT TELL UPON YOUR HEALTH...'

Now, if some works of Acharya are contested .... One thing should be remembered that his works, so many years ago, have *paved the way for the modern chemists.*

Even though P.C.Ray materialised nis ideas in the end of the 19th century, but he has not lost relevance in today's world & when we the "Gen Y" people, as we pride ourselves on, look upto this great enterpreneur for his ideas as father figure.

So its correct to say with rabindranath :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "উপনিষদে কথিত আছে যিনি এক তিনি বললেন আমি বহু হব ... প্রফুল্লচন্দ্রও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে।"

Rs. 75/-